

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব

নাকি যুদ্ধ?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কামরুন্নাহার তানিয়া

রোলঃ 23090121729

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব

নাকি যুদ্ধ?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কামরুন্নাহার তানিয়া

রোলঃ 23090121729

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সুদর্ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব নাকি যুদ্ধ? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কামরুন্নাহার তানিয়া, আইডিঃ 23090121729 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা: মুসলিমদের জন্য অর্থনৈতিক দাসত্ব নাকি যুদ্ধ? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছে। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Lania

(স্বাক্ষর)

কামরুন্নাহার তানিয়া

তারিখঃ

আইডিঃ 23090121729

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা
২. বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৩. আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের আধিপত্য
৪. সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম বিশ্ব কেন ও কিভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?
৫. প্রতিবেদন: ঋণ ও সুদের অতল গহ্বরে রাষ্ট্র!
- ৬.. আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামো, ঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বাজার ব্যবস্থা এবং বীমা ও ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের প্রভাব
৭. World Bank
৮. IMF
৯. Dollar System
১০. NGO
১১. মুক্ত বাজার অর্থনীতি (Free Market)
১২. উন্মুক্ত অর্থনীতি (Open Economy)
১৩. ক্রেডিট কার্ড
১৪. DPS
১৫. সার্বজনীন পেনশন স্কিম
১৬. বন্ড-ডিবেঞ্চার
১৭. বীমা
১৮. স্টক এক্সচেঞ্জ

১৯. প্রচলিত সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা
২০. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২১. বাণিজ্যিক ব্যাংক
২২. কৃষি ব্যাংক
২৩. শিল্প ব্যাংক
২৪. বিনিয়োগ ব্যাংক
২৫. বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক
২৬. বেসরকারি ব্যাংক
২৭. সঞ্চয়ী ব্যাংক
২৮. ইসলামী অর্থনীতি
২৯. সুদের পরিচয়
৩০. সরল সুদ
৩১. চক্রবৃদ্ধি সুদ
৩২. রিবা ও সুদ কি এক? Can it be called "Cost of fund" or "Cost of administration"?
৩৩. কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রিবা
৩৪. রিবাল কুরআন বা রিবান্-নাসিয়াহ
৩৫. রিবাস্-সুন্নাহ বা রিবাল বৃথু
৩৬. রিবাদ দাইন
৩৭. রিবাল ফযল
৩৮. রিবান নাসা

৩৯. সুদের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ
৪০. সুদের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস
৪১. ইসলাম অপরিহার্য বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করেনি
৪২. সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা
৪৩. সুদ সংশ্লিষ্টতায় পার্থিব জীবনের ক্ষতি
৪৪. সুদ সংশ্লিষ্টতায় পরকালীন জীবনের ক্ষতি
৪৫. ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪৬. সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প: সুদমুক্ত অর্থনীতির কাঠামো ও প্রয়োগ
৪৭. প্রথম বিকল্প: 'মুদারাবা'
৪৮. দ্বিতীয় বিকল্প: 'মুশারাকা'
৪৯. তৃতীয় বিকল্প: 'মুরাবাহা'
৫০. চতুর্থ বিকল্প: 'ইজারা' (Leasing)
৫১. কর্জে হাসানা কিভাবে সুদের বিকল্প হতে পারে?
৫২. যাকাত: সুদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইসলামের ন্যায্য অর্থনৈতিক সমাধান
৫৩. সুকুক এবং শরীয়াহ: বর্তমান সমস্যা ও করণীয়
৫৪. শরীয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা
৫৫. আধুনিক ও সমসাময়িক মাসয়ালা
৫৬. ব্যাংকে চাকুরী করা হারাম কেনো?
৫৭. ইসলামী ব্যাংকে চাকুরী করা বৈধ?
৫৮. ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খোলার বিধান

৫৯. প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো কতটুকু শরীয়াহসম্মত?

৬০. ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

৬১. সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

৬২. উপসংহার

৬৩. সুপারিশ

৬৪. রেফারেন্স

■ ভূমিকা:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, ‘ব্যবসাও তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ-বাণী এসে গেছে, সে যদি (সুদী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা তারই। আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় (সে কাজই) করল, তো এরূপ লোক জাহান্নামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

—আল বাকারা ২:২৭৫

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا ظَهَرَ الزَّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَهْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"যখন কোনো সমাজে ব্যভিচার ও সুদ প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের উপর আল্লাহর শাস্তি আহ্বান করে নেয়।"

—হাকেম:২:৩৭, হাদীস:২২৬১

‘সুদ’ ফারসী শব্দ। যার অর্থ ঋণ দিয়ে সেই টাকার উপর আদায়কৃত লভ্যাংশ। আরবীতে একে রিবা (الربا) বলা হয়। যার অর্থ হলো বৃদ্ধি। শারঈ পরিভাষায় ربا هو نفعا فهو ربا ‘প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনয়ন করে, সেটাই রিবা। এটি জাহেলী আরবেও চালু ছিল। ইসলাম এসে যা হারাম করে।

সুদ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার। পুঁজিবাদকে যদিও আমরা অর্থব্যবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি কিন্তু ফাংশনালী এটি একটি দ্বীন। ব্যক্তি থেকে সমাজ কিংবা ওয়াশরুম থেকে রাষ্ট্র সবকিছুকে এটি

প্রোগ্রামিংয়ের মতো নিয়ন্ত্রণ করে, স্বতন্ত্র নীতিমালা গড়ে দেয়। ক্রমাগত পুঁজি বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে উদ্ধৃত এই পুঁজিবাদের চোখে ব্যক্তি কেবলই একজন ভোক্তা। ভোক্তার জীবনদর্শন হচ্ছে Yolo (you only live once)। অতিমাত্রার এই ভোগবাদী চিন্তা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তার নাড়ি থেকে। অণু পরমাণুর মতো ক্রমাগত ভেঙ্গে-চুরে ক্ষুদ্র হচ্ছে পরিবার কাঠামো।

মানব সমাজে অর্থ ও সম্পদ শুধু জীবনধারণের মাধ্যম নয়, বরং একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বও বহন করে। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত সুদভিত্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে অর্থকে সময়ের বিনিময়ে বৃদ্ধি করার অধিকার দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং, বৈদেশিক ঋণ, IMF, World Bank নীতি এবং বহুজাতিক কোম্পানি সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধনী দেশ ও শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম দেশসহ বহু দুর্বল রাষ্ট্রকে ঋণ ও সুদের ফাঁদে আটকে রাখে। ফলাফল—দারিদ্র্য বৃদ্ধি, সম্পদের বৈশ্বিক অসম বণ্টন, সামাজিক বৈষম্য ও অপরাধ বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়, সার্বভৌমত্বের সংকট ইত্যাদি।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে সুদের অবস্থান, আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও সুদভিত্তিক ঋণ, বৈশ্বিক বন্ড ও মানি মার্কেট, মুদ্রানীতিতে সুদের প্রভাব, বাজারে অস্থিতিশীলতা, সুদভিত্তিক অর্থনীতির সংকট প্রবণতা, বৈশ্বিক দারিদ্র্য ও ঋণ-দাসত্ব সমসাময়িক সুদভিত্তিক আধুনিক বিশ্বের এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার বিপরীতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদভিত্তিক এই কাঠামোর সমস্যা, ইসলামী বিকল্প কাঠামো, ঝুঁকি বন্টন ভিত্তিক মডেল মুশারাকা, মুদারাবা, সম্পদভিত্তিক লেনদেন মুরাবাহা, সালাম, ইজারা, যাকাত: নৈতিক ও মানবিক অর্থনীতি গঠনের কারিগর, বৈশ্বিক অর্থনীতির পুর্গঠনে ইসলামী অর্থনীতির ভূমিকা, Interest free Global Banking Model, Sukuk (Islamic Bonds) as Global Alternative, Ethical & sustainable finance, ইসলামে সুদ হারাম হওয়ার যৌক্তিক কারণ ও তার বিশ্লেষণ ইত্যাদিসহ আরও নানাবিধ বিষয়াবলি বক্ষ্যমাণ গবেষণাপত্রটির আলোচ্য বিষয়।

এই গবেষণাপত্রটির মূল উদ্দেশ্য—

- বৈশ্বিক সুদভিত্তিক অর্থনীতির কাঠামো ও এর প্রভাব মুসলিম দেশগুলোর ওপর কেমন তা বিশ্লেষণ করা।
- ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রিবার নিষেধাজ্ঞা ও নৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরা।

- সুদভিত্তিক ব্যবস্থা মুসলিম সমাজের জন্য “অর্থনৈতিক দাসত্ব” নাকি কুরআনিক অর্থে “যুদ্ধ” তা ব্যাখ্যা করা।
- সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তার বাস্তবায়ন সম্ভাবনা যাচাই ও প্রমাণ।

পাশাপাশি কিছু Research Questions বা গবেষণা প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনাটি আরো বেশি স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো। যেমন—

- বৈশ্বিক সুদভিত্তিক অর্থনীতি মুসলিম দেশগুলোর জন্য কেন ক্ষতিকর?
- ইসলামে রিবা কেন নিষিদ্ধ? রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি?
- সুদভিত্তিক ব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোকে কিভাবে অর্থনৈতিক দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়?
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে আর কতদিন যুদ্ধ?
- সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হলে ব্যাংক ও ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে চালু থাকবে?
- সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব সম্ভাবনা ও প্রভাব কী হতে পারে?

মুসলিম উম্মাহর জন্য এটি শুধু একাডেমিক গবেষণা নয়। বরং— নীতি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য এক অনন্য প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ।

■ বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিকভাবে একটি সংযুক্ত এবং জটিল আন্তঃনির্ভর কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দেশগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ঋণ, সুদ এবং বৈদেশিক তহবিলের মাধ্যমে। এই কাঠামোতে ধনী দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোই মূলত নীতি নির্ধারণ করে থাকে। মুসলিম দেশগুলো প্রায়শই এ কাঠামোর শর্তে পরিচালিত হয়, যার ফলে তাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বহুজাতিক কোম্পানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, ব্যাংকিং এবং মুদ্রা নীতি সব মিলিয়ে একটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক জাল গড়ে উঠেছে। মূলত ধনী দেশ এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আর্থিক

প্রতিষ্ঠান (যেমন IMF, World Bank) বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে আধিপত্য রাখে, এবং দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোকে তাদের শর্তে পরিচালিত করে।

যদিও এটি আধুনিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করে, বাস্তবে এটি ক্রমাগত দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ঋণপ্রবণ করে রাখে। সুদের কারণে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, তুলনামূলক দুর্বল দেশগুলোর স্বাধীন নীতি গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত হয় এবং মুসলিম দেশগুলো অর্থনৈতিক দাসত্বের ফাঁদে পড়ে।

■ আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের আধিপত্য: সারা বিশ্বের অর্থনীতি আজ এমনভাবে সুদের জালে

জড়িয়ে গেছে যে রাষ্ট্র, ব্যাংক, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান—সবার মূল চালিকাশক্তিই ঋণ ও সুদনির্ভর।

আন্তর্জাতিক বণ্টন বাজার, বৈদেশিক ঋণ, IMF-World Bank এর লোন—এসবের মাধ্যমে দেশগুলো সুদের কাঠামোর বাইরে থাকার সুযোগ প্রায় হারিয়েছে। উৎপাদন থেকে অবকাঠামো, এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্যও সুদের হারকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে সুদ বৈশ্বিক অর্থনীতির “Rule-setter” হয়ে গেছে। উন্নত দেশগুলোর সুদের নীতি দরিদ্র দেশগুলোর মুদ্রা, আমদানি ব্যয় ও বাজেট ঘাটতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ে এবং বিশ্ব অর্থনীতি একটি চক্রে আটকে যায় যেখানে সুদ ছাড়া চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুদভিত্তিক অর্থনীতির আধিপত্যই হয়ে উঠেছে বিশ্ব অর্থনীতির মূলমন্ত্র। অথচ, ইসলামী অর্থনীতি এই সুদনির্ভর কাঠামোকে মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে।

■ সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম বিশ্ব কেন ও কিভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত ঋণভিত্তিক এবং সুদনির্ভর। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাঠামোতে এখনও পিছিয়ে থাকায় তারা এই সুদভিত্তিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি প্রভাবভোগী।

১. আন্তর্জাতিক ঋণ ও উচ্চ সুদ:

- মুসলিম বিশ্বের বহু দেশ উন্নয়ন প্রকল্প ও সরকারি ব্যয় চালানোর জন্য বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল।

- এই ঋণগুলোতে উচ্চ সুদ ধার্য থাকে, যেমন Sovereign Bonds বা IMF/World Bank ঋণ।
- সুদ পরিশোধের জন্য দেশগুলোর বাজেটে চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়ন খাতে পর্যাপ্ত তহবিল থাকে না।
- ঋণ চক্র দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়—মূলধনের পাশাপাশি সুদ দিতে দিতে দেশ ধনসংকটের মধ্যে পড়ে।

২. সম্পদের কেন্দ্রায়ণ ও বৈষম্য:

- সুদভিত্তিক অর্থনীতি মূলত ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোতে উৎপাদন ও শিল্পের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় তারা এই অর্থনীতির প্রধান উপকৃত হতে পারে না।
- ফলে ধনী দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধা পায়, আর মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক সুবিধা কমে।
- বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণ ক্রমশ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

৩. ঋণ ও বাজারের নিয়ন্ত্রণে সীমিত ক্ষমতা:

- বৈদেশিক বিনিয়োগ, স্টক ও বন্ড মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম দেশগুলোর প্রভাব সীমিত।
- সুদের হার এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে সিদ্ধান্ত বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- ফলে দেশের নিজস্ব নীতি গ্রহণের স্বাধীনতা কমে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

৪. উৎপাদন, শিল্প ও বিনিয়োগে সীমাবদ্ধতা:

- উচ্চ সুদ হার ও ঋণ-নির্ভর অর্থায়নের কারণে স্থানীয় শিল্প ও উৎপাদনে বিনিয়োগ কম হয়।
- এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রোডাকশন ও দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তি কমে।
- অর্থনীতির স্বাবলম্বিতা হ্রাস পায় এবং বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

৫. সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব:

- সুদভিত্তিক কার্যক্রম সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

- ধনীর সম্পদ আরও বৃদ্ধি পায়, আর নিম্নবিত্ত ও ঋণগ্রস্ত জনগণ ক্রমশ চাপের মধ্যে পড়ে।
- ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ন্যায্য নয়, কারণ সুদ অর্থের ওপর অর্থ বাড়ায়, কোনো প্রকৃত উৎপাদন বা ঝুঁকি ভাগাভাগি ছাড়াই।

৬. আর্থিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা:

- ঋণ ও সুদ নির্ভর অর্থনীতি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করে।
- ঋণ বোঝা বেড়ে গেলে সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈদেশিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

■ প্রতিবেদন: ঋণ ও সুদের অতল গহ্বরে রাষ্ট্র!

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে একটি বিষয় দেখে আঁতকে উঠেছেন অনেকেই। তা হচ্ছে বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দের খাত। এবারের বাজেটে সরকারের পরিচালন ব্যয়ে ২২% বরাদ্দ রাখা হয়েছে সুদ পরিশোধ খাতে। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের নেওয়া ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য এক লক্ষ তেরো হাজার পাঁচ শ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। একক খাত হিসেবে নতুন বাজেটে এটিই বৃহত্তম ব্যয়। যদিও বিগত কয়েক বছর থেকেই সরকারের ঋণ ও সুদের ব্যয় ব্যাপক হারে বাড়ছিল। আমরাও বাজেট আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময় কিছু আরজ করেছিলাম। কিন্তু এ বছর ব্যাপারটি একেবারে প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে।

একটি মুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে ৯০% -এর বেশি লোক ইসলাম ধর্ম এবং কুরআন-সুন্নাহর নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী; কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও চারদিকের বেহায়াপনার সয়লাবের মধ্যে এখনও এদেশের মানুষের একটি বৃহৎ অংশ সুদকে এড়িয়ে চলে। তারা কোনো সুদী লোন গ্রহণও করে না আবার কাউকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ-করজও দেয় না। তাই তাদেরকে সুদ দিতেও হয় না, নিতেও হয় না। কারণ ইসলামে যে বিষয়গুলো খুব কঠোরভাবে হারাম তার একেবারে শুরুর দিকে রয়েছে সুদ আদান-প্রদান। পবিত্র কুরআনুল কারীম এবং বিভিন্ন হাদীস শরীফে সুদদাতা ও সুদ গ্রহীতার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। তাই পুঁজিবাদের এই আগ্রাসনের

মধ্যেও অনেকেই সম্বন্ধে সুদকে এড়িয়ে চলতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। কিন্তু সরকারের বাজেট হিসাব দেখার পর কেউ কি আর নিজেকে সুদমুক্ত ভাবে পারবেন? আপনি কোনো সুদী ঋণ গ্রহণ করেন না; তাই আপনাকে সুদ দিতে হয় না। আর সুদভিত্তিক কোনো ঋণ আপনি অন্যকে প্রদানও করেন না; তাই আপনার সুদ গ্রহণের প্রশ্নও আসে না। এতটুকুতে সন্তুষ্ট থাকার সুযোগ কি আর আছে?

জনগণ সুদী ঋণ গ্রহণ না করলেও, কাউকে সুদ প্রদান না করলেও দেশের ক্ষমতাবানেরা তো জনগণের নামে কাড়ি কাড়ি সুদভিত্তিক ঋণ নিয়ে থাকেন। সে ঋণ বাড়তে বাড়তে এত বেশি হয়েছে, যার সুদ আদায়ের জন্য জাতীয় বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। এক-দুই কোটি, একশ কোটি বা এক হাজার কোটি নয়; বরং এক লক্ষ তেরো হাজার পাঁচ শ কোটি টাকা শুধু সুদ বাবদই সরকার পরিশোধ করবে। একথা সবারই জানা যে, এ টাকা সরকার জনগণের থেকে নেওয়া ভ্যাট, আয়কর ও অন্যান্য শুল্ক থেকেই পরিশোধ করবে।

দেশের একজন হতদরিদ্র থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ধনী, সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে বড় থেকে বড় আলেম ও বুয়ুর্গ কেউই তো সরকারকে কর না দিয়ে বাঁচতে পারে না। মোবাইল ফোনে এক শ টাকা রিচার্জ করলে চল্লিশ টাকার মতো নিয়ে যায় সরকার। ক'জন নাগরিক আছেন, যিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার না করে থাকতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের জরুরি কেনাকাটায় মূল্যসংযোজিত করও তো ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকেই নিজ হাতে পরিশোধ করতে হয়। সরকারের আয়ের সর্বোচ্চ খাতও এ ভ্যাট, যা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে পরিশোধ করতে হয়। আর ধনীদের আয়করের বোঝাও পরোক্ষভাবে সাধারণ জনগণ তথা ভোক্তাদের ওপরই বর্তায়। তাই সুদ পরিশোধে যে টাকা ব্যয় হয়, তাতে ধার্মিক ও অধার্মিক সকল শ্রেণির লোকের অর্থই রয়েছে।

কেন এত সুদ?

একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থকড়ি তো লাগবেই। যারা জনগণকে সেবা দেবে, নিরাপত্তা দেবে তাদের বেতন-ভাতা এবং অতীব জরুরি অবকাঠামো উন্নয়নের পেছনেও অর্থ ব্যয় হবে। কিন্তু

একটি সরকারকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সুদ কেন পরিশোধ করতে হবে? এর জবাবও বাজেট বিশ্লেষণের মধ্যে রয়েছে। জানা কথা যে, সুদ প্রদান করতে হয় অপরিশোধিত ঋণের জন্য। আর বাংলাদেশ সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এ বছরের বাজেটে ঋণের স্থিতি প্রাক্কলন করা হয়েছে একুশ লক্ষ বাষটি হাজার চার শ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২২ -এ ঋণের স্থিতি ছিল তেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাত শ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই বছরের মধ্যেই আট লাখ কোটি টাকার মতো ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী তিন বছরে সরকারের ঋণ সাতাশ লাখ কোটি টাকা ছাড়াবে বলে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। (বণিকবার্তা)

এইসকল ঋণের সুদ পরিশোধের জন্যই এখন সরকারকে জনগণ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কর নিতে হয়।

কেন এত ঋণ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারকে এত ঋণ কেন করতে হয়? বিষয়টি সহজে অনুধাবন করার জন্য আমরা কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি। ঘটনাগুলো বাস্তবসম্মত। নামগুলো ছদ্ম।

মাহের একজন সাধারণ চাকরিজীবী। টানাটানির সংসার হলেও ঋণ-করজের অভ্যাস ছিল না। আয় বুঝে ব্যয় করে চলতে অভ্যস্ত ছিল তার পরিবার। বাড়িতে ভালো টিনের ঘর। মাঝে মাঝে মেরামত করতে হলেও বসবাসে তেমন কোনো অসুবিধা ছিল না।

হঠাৎ মাহেরের মাথায় এল গ্রামের অনেকেই বাড়িতে দালান তুলছে। তাকেও তাই করা উচিত। সে চিন্তায় নিজের সামান্য জমা টাকা দিয়ে কিছু ইট কিনে ফেলল। এরপর চার-পাঁচ কামরার একটি ঘরের ডিজাইন করাল স্থানীয় ঠিকাদারদের দিয়ে। ঘরটির ফাউন্ডেশন দিতে গিয়ে নিজের দামি জমিটিও বিক্রি করে দিল। কিন্তু কোনো রকম ছাদ ঢালাই হয়ে গেলেও ঘরের কাজ আর শেষ হয় না। বাধ্য হয়ে মাহের গৃহঋণের জন্য ছোট্টাছুটি করে। একসময় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পেয়েও যায়। ঋণের মেয়াদ যত বেশি, সুদের পরিমাণও ততই অধিক। সে ঋণ আর সুদ কখনো শেষ হয় না। যেহেতু তার আয় সীমিত, তাই ঋণের কিস্তি ও সুদ আদায় করতে গিয়ে আরও ঋণ নিতে

হয়। যার জন্য সুদের পরিমাণও বেড়ে যায় নতুন করে। এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে, সাধারণ বিচারে মাহের তার জীবদশায় এই ঋণ ও সুদ থেকে পরিদ্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

সুরুজ মিয়া লেখা-পড়া তেমন করেননি। তবে মেহনতি মানুষ। চার-পাঁচ জনের সংসার। গায়ে-গতরে খেটে যা কামাই করেন তা দিয়ে সংসার কোনোরকম চলে যায়। সন্তানাদিকে কম খরচের বিদ্যালয়ে পড়াতে পারেন। সবকিছু একরকম স্বাভাবিকভাবে পার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কয়েক বছর থেকে সুরুজের পরিবারে হতাশা ও বিষণ্ণতা নেমে এসেছে। সুরুজ সাধারণ আয় রোজগার থেকে যা অর্জন করে, তার বড় একটি অংশই এখন ফড়িয়াদের ঋণ-সুদের কিস্তি পরিশোধে ব্যয় হয়ে যায়। যার দরুন ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্র কিনতে গিয়েও এখন তাকে আবার সুদী ঋণ নিতে হয়।

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল একটু ভিন্নভাবে। সুরুজের পরিবার দুই-তিন বছর আগ থেকেই তার মধ্যে ব্যতিক্রম ভাব লক্ষ করেছে। রাত করে বাড়িতে ফেরা, খারাপ লোকদের সাথে আড্ডা দেওয়া এবং পরবর্তীতে নেশাজাত দ্রব্য জড়িয়ে পড়া— এসব কারণে গ্রাম্য ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া মহাজনদের কাছে তার নেওয়া সুদী ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে, যা কয়েক বছর আগেও ছিল একেবারে শূন্য। টানাটানির সংসার হলেও তাদেরকে কখনো ঋণ করে চলতে হয়নি। এখন তার আয়রোজগারের সিংহভাগই ব্যয় হয়ে যায় সুদ পরিশোধে। সে সুদ আদায়ের জন্য আবার নতুন ঋণ, সে ঋণের আবার বাড়তি সুদ। জীবন যেন সুদে আর ঋণে, ঋণে আর সুদে আবদ্ধ হয়ে গেছে। পরিবারটির জমি-জিরাত যা ছিল তা শেষ হয়ে এখন ভিটেবাড়িও যাওয়ার অবস্থা।

সেলিম একজন ছাত্র। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। স্কুল ও কলেজ জীবন মোটামুটি ভালোই পার হয়েছে। হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে। বাড়ি থেকে যা খরচাদি পেয়েছে, তা দিয়ে মোটামুটি চলে গেছে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে কিছু বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্য তার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এখন সে তার স্বাভাবিক আয়ের তুলনায় নিয়মিতই বেশি ব্যয় করে। দামি ব্র্যান্ডের ফাস্টফুড ও কফি শপে তার যাতায়াত নিয়মিত। ক’দিন পর পর নতুন নতুন

মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিভাইস খরিদ করে সে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে আরও হরেক রকম খরচ বেড়েছে তার। যে কারণে মা-বাবার পাঠানো অর্থে তার আর এখন কোলায় না। প্রতি মাসেই সে ঋণ করে। একসময় সুদী ঋণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ঋণদাতাদের এসব ঋণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধের দায়ভারও তার পরিবারের ওপর গিয়ে বর্তায়। মধ্যবিত্ত পরিবারটি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তানের পরিবর্তিত জীবনের গ্লানি বইতে বইতে একসময় নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আরজু সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ভালো চাকরি করেন। কয়েক লক্ষ টাকার মাসিক বেতন-ভাতা। স্বচ্ছন্দেই চলে জীবন। কামাই যেমন বেশি, ভদ্রলোক তেমন খরুচেও। নিয়মিত নামি-দামি রেস্টোরাঁয় গিয়ে খাওয়া। সুযোগ পেলেই দেশ-বিদেশে বেড়াতে চলে যাওয়া— এসব খাতে তার মোটা অংকের বেতনের একটি বিরাট অংশ খরচ হয়ে যায়। তাই জমা থাকে না তেমন কিছুই। অবশ্য টানাপোড়েন, ঋণ-করজও নেই। কিন্তু কয়েক বছর থেকে লোকটির জীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। এখন আর তার সংসার আগের মতো চলে না। তার ব্যাপারটি একটু ভিন্ন রকম। তাকে পেয়ে বসেছে বড় বড় ব্র্যান্ডের ইএমআইএ। পুঁজিবাদে পণ্য বিপননের একটি নতুন কৌশল হচ্ছে, কিস্তির বিক্রি। যাবতীয় বিলাস দ্রব্য, ভ্রমণ প্যাকেজ, প্লট, ফ্ল্যাটের ব্যবসা, ব্যক্তিগত গাড়ি ও গেজেটস, ঘরোয়া ফার্নিচার ও অন্যান্য আসবাবপত্রসহ অসংখ্য পণ্য এখন বিক্রি হয়ে থাকে কিস্তি সুবিধায়। ছয় মাস, বারো মাস, চব্বিশ মাস, ছত্রিশ মাস এবং গাড়ি ও প্লট-ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে দশ-বিশ বছরের কিস্তি সুবিধাও পাওয়া যায়।

একটি মোবাইল কোম্পানি নতুন সেট নিয়ে এল। দাম দেড়-দুই লাখ টাকা। তা তো আর শুধু কোটিপতিদের কাছে বিক্রি করে ব্যবসা চলবে না। তাই সুকৌশলে উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তকেও নিজেদের খরিদদার বানাচ্ছে। শুরুতেই বারো মাস-চব্বিশ মাসের ইএমআই সুবিধা ঘোষণা করছে। বলা হচ্ছে, আপনি মাসিক মাত্র আট/দশ হাজার টাকা কিস্তি দিয়ে পণ্যটি পেতে পারেন। দামি ব্র্যান্ডের সকল ফার্নিচারের সকল দোকানে রয়েছে ইএমআইয়ের সুবিধা। প্রায় সকল ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যেও এসব সুবিধা রয়েছে। যার দরুন ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ না করে অনেকেই প্রতি বছর বিভিন্ন উৎসবে ঘরের যাবতীয় ফার্নিচার পরিবর্তন করে ফেলেন। মোবাইল ফোন,

ল্যাপটপ, টেলিভিশন, এসি, ফ্রিজ এবং এজাতীয় অন্যান্য পণ্যেও নতুন মডেল বা প্রযুক্তি আসলেই ইএমআই সুবিধা নিয়ে সংগ্রহ করে ফেলেন।

আরজু সাহেবও এই খপ্পরে পড়েছেন। তার সাবলম্বি সংসার এখন ইএমআইয়ের ফাঁদে বন্দি হয়ে পড়েছে। তাকে এখন প্রতি মাসে লক্ষ টাকার বেশি কিস্তিই পরিশোধ করতে হয়। যার কারণে শিশুদের স্কুল খরচ এবং সংসারের দৈনন্দিন খরচে প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। দামি স্কুলের মোটা ফি, অভিজাত এলাকার ফ্ল্যাট ভাড়া এগুলো আগে পরিশোধ করা কঠিন না হলেও এখন আর তিনি স্বাভাবিকভাবে তা আদায় করতে পারছেন না। অথচ যেই যেই বস্তুগুলোর জন্য কিস্তি আদায় করছেন, সেগুলোর কোনোটিই তার জন্য অপরিহার্য ছিল না। এসবই পরিবর্তন করেছেন শখের বশবর্তী হয়ে। অথবা আপডেট প্রযুক্তি খরিদের মানসিকতা থেকে। কিন্তু জীবন তো আর সহজে থেমে যায় না। আরজু সাহেবের পরিবার হঠাৎ করে তাদের খরচ কমাতে পারে না। যার দরুন শুরু হয় ঋণ। অভিজাত্য ও মান বাঁচানোর তাগিদে ঋণ ও সুদ তাদের জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। একসময় ভালোভাবে চলা একটি সুশিক্ষিত পরিবার ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে চোখে অন্ধকার দেখে।

প্রিয় পাঠক, একজন মানুষ ব্যক্তি জীবনে কীভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে পেশ করা হল। যদিও মানুষের ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং অনাকাক্সিক্ষত বিভিন্ন সমস্যা এবং সাধারণ জীবন যাপনের খরচাদি জোগাড় করতে না পারার কারণেও অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের মতো রাষ্ট্রের ঋণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি ওপরের উদাহরণগুলোর সাথেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানবজীবনের স্বাভাবিক স্বীকৃত নিয়ম, যা বুদ্ধিমান মা-বাবারাও সন্তানাদিকে তালীম দিয়ে থাকেন। তা হচ্ছে, ‘আয় বুঝে ব্যয় করা।’ কিন্তু এ যুগের রাষ্ট্রগুলো চলে এর ঠিক বিপরীত পথে। সে আগে নিজের একটি ব্যয়ের তালিকা বানায়। এরপর আয় করার চেষ্টা করে। সে আয়ের জন্য সাধারণ নাগরিকদের ওপর আরোপিত হয় বিশাল করের বোঝা। যার কারণে মূল্যস্ফীতিতে নাভিশ্বাস ওঠে

গণমানুষের। এতেও রাষ্ট্রের খরচ কুলায় না। সে এবার ঋণ-করজ নেওয়া শুরু করে। দেশ-বিদেশ থেকে নেওয়া এসব ঋণ প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। সাথে ঋণের সুদও।

আলোচিত ২০২৪-২৫ -এর বাজেটের দিকে তাকালেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সনে রাষ্ট্র তার খরচের প্রাক্কলন করেছে সাত লক্ষ সাতানব্বই হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে ভ্যাট ও কর ইত্যাদি বাবদ আয় করার আশা করেছে পাঁচ লক্ষ একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে, মানুষের ওপর মোটা অংকের কর বসিয়েও রাষ্ট্র তার প্রাক্কলিত ব্যয় সাত লক্ষ সাতানব্বই হাজার কোটি থেকে দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা পেছনে থেকে গেছে! এটিকেই বলা হয় ঘাটতি বাজেট। এই দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা (যা পুরো বাজেটের প্রায় এক তৃতীয়াংশ) সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন করে ঋণ করবে। অর্থাৎ পরবর্তী অর্থবছরে সরকারের ঋণের পরিমাণ যেমন বাড়বে, সুদ পরিশোধের জন্যও আরও অধিক বরাদ্দ রাখতে হবে। কারণ যত ঋণ, তত সুদ। সুদ আদায়ের জন্য নতুন করে আবার ঋণ।

রাষ্ট্র কি ঋণ এড়াতে পারে না?

প্রশ্ন হচ্ছে, যে ঋণের জন্য সাধারণ নাগরিকগণ এবং আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ব্যক্তি জীবনে সুদ ও ঋণ এড়িয়ে চলা এদেশের মুসলিম সমাজও পরোক্ষভাবে সুদের বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে, রাষ্ট্র কি সে ঋণ এড়িয়ে চলতে পারত না। ঋণ-করজ ছাড়া একটি রাষ্ট্রের কি চলা অসম্ভব? এর সহজ জবাব হচ্ছে, অবশ্যই রাষ্ট্র চাইলে ঋণ-করজ এড়িয়ে চলতে পারত। এটি কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। শুধু ঋণগ্রহণই নয়, বরং রাষ্ট্র যদি কল্যাণমুখী এবং স্বকীয়তা নিয়ে চিন্তা করত, তাহলে সে ঋণগ্রস্ত তো হতই না; বরং তাকে স্বাভাবিক খরচাদি নির্বাহের জন্য এত মোটা অংকের করও জনগণের ওপর বসাতে হত না।

আমাদের মতো দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে ক্ষমতাবানেরা এবং আমলাশ্রেণি যেভাবে বিলাসিতা করে রাষ্ট্রের টাকা উড়ায়, এ নামে সে নামে ঘন ঘন বিদেশ গমন করে যেভাবে ডলার ব্যয় করে, ভিআইপি, ভিভিআইপিদের সুবিধা ও প্রটোকলে যেভাবে দুহাতে অর্থ ব্যয় করা হয়— সেগুলোর লাগাম টানলেও হাজার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া এখন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে যত মোটা

অংকের বরাদ্দ রাখা হয় এবং একেকটি প্রকল্পের মেয়াদ বারবার বাড়িয়ে যেভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ বাড়ানো হয়— এসবের লাগাম টেনে ধরলে এবং সাধ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিলে রাষ্ট্রকে এ বিপর্যয়ে পড়তে হত না। এখন ঋণ করে ঘি খাওয়ার যে অভিলাষ ও মিছে আত্মতৃপ্তিতে রাষ্ট্র আবর্তিত হয়েছে এবং জনগণকে ঋণ ও সুদের বোঝার চাপে যেভাবে ক্ষমতাবানেরা আবদ্ধ করেছে, আগে থেকে সুবুদ্ধি, স্বকীয়তা এবং নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবমুখী চিন্তা করে অগ্রসর হলে কিছুতেই আজকের অবস্থা দেখতে হত না। চিন্তা করা যায়, একটি দেশ যত টাকা ঋণের চাপে আবদ্ধ রয়েছে, সে টাকা দিয়ে তার কয়েক বছরের বাজেট পূরা করা যেতে পারে। যত টাকা সে সুদ পরিশোধ করে, তা দিয়ে বছরের এক পঞ্চমাংশের মতো খরচ সহজেই নির্বাহ করা সম্ভব।

আমরা আমাদের ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থাই শুধু হারাইনি; বরং এসবের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও অন্যদের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছি। একদিকে উন্নয়নের বড় বড় বুলি আওড়ানো, মাথাপিছু আয়ের ফুটানি দেখানো, ইট-কংক্রিটের কতগুলো কাঠামো বানিয়ে উন্নতির দাবি তোলা, অন্যদিকে প্রতিনিয়ত ঋণ ও সুদের বোঝা বৃদ্ধি করা, মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ আয়ের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা— এই হচ্ছে হাল আমলের বাংলাদেশ এবং এধরনের অন্যান্য রাষ্ট্রের চিত্র। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

পরিশেষে আরেকটি কথা। তা হচ্ছে, রাষ্ট্র যে জনগণের নামে মোটা অংকের ঋণ করে এবং সে ঋণের সুদ পরিশোধ করে, তার গোনাহ কি জনগণের ওপর বর্তাবে?

এক অর্থে তো এর দায়ভার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। কারণ এখনকার সরকারগুলো তো নিজেদেরকে জনগণের প্রতিনিধি নাম দিয়েই বসে থাকে। তাই তাদের কাজ মানে জনগণের কাজ। কিন্তু ভিন্ন আরেকটি বাস্তবতা তো সবারই জানা। ক্ষমতাবানেরা নিজেদেরকে জনপ্রতিনিধি নাম দিলেও অনেক ক্ষেত্রে আসলে গায়ের জোরেই ক্ষমতা আঁকড়ে রাখে। এছাড়াও অনেক দেশের অনেক প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরাও ঋণগ্রহণ ও সুদ পরিশোধ এবং অন্যান্য অনেক কাজে জনগণের ইচ্ছার বাইরে কাজ করে থাকে। সেই বিচারে জনগণের গোনাহও রাষ্ট্রের ক্ষমতাস্বার্থ ও নীতি

নির্ধারকদের কাঁধে গিয়ে পড়বে— একথাও বলা যায় সন্দেহাতীতভাবে। অবশ্য তাওবা করতে হবে সকলকেই। নিজেদের নামে রাষ্ট্রের নেওয়া সুদী ঋণের জন্য যার যার সাধ্য অনুযায়ী ঘৃণাও প্রদর্শন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ঋণ ও সুদ শুধু লজ্জিত এবং অপদস্থই করে না; বরং একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার, একটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি রাষ্ট্র ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে পতিত করা এবং ডুবিয়ে দেওয়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

■ আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামো, ঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বাজার ব্যবস্থা এবং বীমা ও

ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের প্রভাব:

আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামো বর্তমানে এমনভাবে বিন্যস্ত যে ঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বৈশ্বিক বাজারব্যবস্থা, এবং ব্যাংকিং ও বীমা কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি স্তর সুদনির্ভর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই আর্থিক স্থাপত্য পুঁজি বণ্টন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলে, বিশেষত উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোকে কাঠামোগত ঋণ-নির্ভরতার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আর্থিক বৈষম্য, স্থিতিশীলতা সংকট এবং নৈতিক অস্বচ্ছতা আরও তীব্রতর হয়ে একটি টেকসই ও ন্যায্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ—

■ **World Bank:** বিশ্বব্যাংক একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মূলধন কর্মসূচির জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। এটি মূলত দুটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত: পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD) এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)।

বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করে, যার জন্য তারা একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ চার্জ করে, যদিও এই সুদের হার দেশ ভেদে এবং ঋণের ধরনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

ঋণের সুদের হার বিশ্বব্যাংকের বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের খরচ এবং দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

বিশ্বব্যাংকের ঋণের সুদের কাঠামো–

- **মধ্যম আয়ের দেশ:** IBRD-এর মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে বিশ্বব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে কম সুদে ঋণ দেয়।
- **নিম্ন আয়ের দেশ:** IDA-এর মাধ্যমে, বিশ্বব্যাংক সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোকে প্রায়ই সুদমুক্ত বা খুব কম সুদে (রেয়াতমূলক) ঋণ বা অনুদান দেয়।
- **কঠিন শর্তের ঋণ (নন-কনসেশনাল):** এটি সাধারণত কঠিন শর্তযুক্ত এবং উচ্চ সুদের হারে পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাংক এই ধরনের ঋণের জন্য ৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ চাইতে পারে।
- **সুদের হার পরিবর্তনশীল:** ঋণের সুদের হার নির্ধারিত হয় বিশ্বব্যাংকের অর্থ সংগ্রহের খরচ এবং ঋণগ্রহীতা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বিশ্বব্যাংক একটি খুবই উদারপন্থী ও জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান। যা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল, অনুন্নত বা দরিদ্র দেশসমূহকে প্রয়োজনে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক কিভাবে সহায়তার আড়ালে সবাইকে অদৃশ্য সুদের জালে জড়িয়ে ফেলছে সে ব্যাপারে যতটুকু সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত দুর্ভাগ্যবশত তা আমাদের মধ্যে একেবারেই নেই।

এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের আরোও অনেক নেতিবাচকতা রয়েছে। যেমন–

ঋণের শর্তাবলী, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে চাপ সৃষ্টি করা। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে এর নীতির কারণে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

- **ঋণের শর্তাবলী:** বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের শর্তাবলী অনেক সময় একটি দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এসব শর্ত পূরণ করতে গিয়ে অনেক দেশকে অর্থনৈতিক সংস্কার করতে হয় যা অনেক ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- **অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ:** বিশ্বব্যাংক তার নীতি ও শর্ত পূরণের জন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বলে অনেকে সমালোচনা করেন। এর ফলে সেই দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে।
- **দারিদ্র্য বিমোচন:** অনেকে মনে করেন, বিশ্বব্যাংকের নীতিগুলি দারিদ্র্য বিমোচনের পরিবর্তে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না।
- **সবুজ বিপ্লবের প্রভাব:** কিছু সমালোচকের মতে, সবুজ বিপ্লবের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছে যা অনেক সময় স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এর ফলে, ঐতিহ্যবাহী কৃষকরা তাদের জীবিকা হারাতে পারে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বব্যাংক দাতা সংস্থা হিসেবে কাজ করলেও ঋণ যখন দেয়, তখন তাদের শর্ত মেনে চলতে বাধ্য করে। সেই সকল শর্তের ফলে দেশের জন্য মঙ্গল এরূপ উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা গরিব ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের নির্দেশ মোতাবেক উদারনৈতিক নীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতার কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংকের শর্ত এবং নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির কারণে বিভিন্ন দেশে ধনী-গরিব ব্যবধান বাড়ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া হলেও গরিবের হার নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। তাই বিশ্ব ব্যাংকের সমালোচনা হচ্ছে প্রচুর। এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, এবং বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোতে বিশ্ব ব্যাংকের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি বা কাঠামোগত সংস্কারের নীতি মারাত্মক ক্ষতি করেছে। বাংলাদেশেও এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এর ফলাফল ভাল হয় নি। তাই প্রতিবাদ হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত Eric Toussaint এর "The World Bank: A Critical History" গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন—

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনগণের বিপক্ষে যাচ্ছে, যা বোঝার জন্য বিশ্বব্যাংকের দেওয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য দেখলেই বোঝা যায়। পুঁজি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, যেখানে একটি ক্ষুদ্র পুঁজিপতি অংশ ফুলে ফেঁপে ধনী হচ্ছে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব হতে থাকছে। বিশ্বের ১০% মানুষ মোট সম্পদের ৫২.১% ভোগ করেন, আর ৫০% গরিবরা ভোগ করেন ৯.৭%। এই তথ্য নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ডেটাবেজ(World Inequality Database) থেকে। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ

উন্নয়নে সহযোগিতা দেবে এটাই তাদের কাজ; কিন্তু যেসব নীতি তারা চাপিয়ে দিচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এখন আর তা নিতে পারছে না।

অর্থাৎ, বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারুক আর নাই পারুক কৌশলে সবার উপর ঋণের বোঝা কিংবা সুদের দায় ঠিকই চাপিয়ে দিচ্ছে।

■ **IMF:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা International Monetary Fund হলো জাতিসংঘের একটি স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক সংস্থা। যা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজ করে। এছাড়াও মুদ্রার হার পর্যবেক্ষণ, নীতিগত পরামর্শ প্রদান, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নসহ অন্যান্য কাজ করে থাকে।

১৯১টি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত এর ঘোষিত লক্ষ্য হল "বিশ্বব্যাপী আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করা, উচ্চ কর্মসংস্থান, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, এবং বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য হ্রাস করা।"

অর্থাৎ, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ যেনো একই সূত্রে গাথা। তাহলে এবার জেনে নেয়া যাক, IMF এর কার্যক্রমে কোনো নেতিবাচকতা আছে কি না। নাকি শুধুই মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রমের এক নিস্বার্থ মহান সংস্থা?

- **কঠোর শর্তাবলী:** ঋণগ্রহীতা দেশগুলোকে প্রায়ই বাজেট ঘাটতি কমানো, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, শুল্ক বৃদ্ধি বা ভর্তুকি কমানোর মতো শর্ত মানতে হয়।
- **জনগণের উপর চাপ:** ভর্তুকি কমানোর ফলে জ্বালানি ও অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়ে, যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ায়।
- **আয় বৈষম্য:** আইএমএফ-এর নীতিগুলি প্রায়শই প্রো-ক্যাপিটালিস্ট (পুঁজিবাদ-পন্থী) হয়, যার ফলে ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আয় বৈষম্য বাড়ে।
- **অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন হ্রাস:** আইএমএফ-এর শর্তাবলী মানতে বাধ্য হওয়ায় একটি দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে।

- **প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব:** সমালোচকরা মনে করেন, আইএমএফ-এর নীতিগুলি স্বল্পমেয়াদী স্থিতিশীলতার উপর বেশি জোর দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে।
- **রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব:** অনেক ক্ষেত্রে আইএমএফ-এর নীতিগুলি একটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং মানবাধিকার রেকর্ডের মতো বিষয়গুলিতেও সমালোচিত হয়েছে।

আইএমএফ এর ঋণের শর্ত হিসেবে আরোপিত কঠোর নীতির কারণে সাধারণ জনগণের ওপর করের বোঝা এবং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, ভর্তুকি কমানো, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ হওয়াসহ নানাবিধ নেতিবাচকতা রয়েছে। সমালোচকদের মতে, আইএমএফ-এর নীতিগুলি প্রায়শই স্বল্পমেয়াদী চাহিদা ব্যবস্থাপনার উপর বেশি জোর দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি বা সামাজিক প্রভাবের উপর কম মনোযোগ দেয়।

The Heritage Foundation এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, "The IMF fails to encourage economic growth policies. The IMF has failed to help less developed countries improve economically." অর্থাৎ, আইএমএফ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে অনুন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নে সাহায্য করতে।

Why the IMF is Unnecessary-র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "The IMF duplicates many of the activities of other organizations. It duplicates some functions of the World Bank."

২০২২ সালভিত্তিক সময় টিভির একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, "আইএমএফ এর ঋণে সুবিধার চেয়ে ঝুঁকিই বেশি।"

আইএমএফ মূলত একটি দেশের স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা পুনরুদ্ধারে ঋণ দিয়ে থাকে। আইএমএফ মূলত কয়েকটি শর্তের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দিয়ে থাকে। সব দেশের জন্য শর্ত এক বিধায় ফলাফল সবসময় এক হয় না। বিশেষ করে আইএমএফের শর্ত মানতে গিয়ে অনেক স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের বিপদে পড়ার রেকর্ডও রয়েছে।

ঋণ দেয়ার আগে আইএমএফ প্রধানত সুদহার বৃদ্ধি ও ভর্তুকি প্রত্যাহারের ওপর শর্তারোপ করে থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে এই দুটি খাত অনেক বেশি স্পর্শকাতর। কোনো ধরনের সমঝোতায় না গিয়ে এ ধরনের শর্ত মেনে নিলে বিপদে পড়তে পারে বাংলাদেশ-এমনটাই ভাবছেন বিশেষজ্ঞরা।

আইএমএফের ঋণ দেয়ার আরেকটি বড় শর্ত ব্যাংক সুদহার বাড়ানো। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, ঋণের ক্ষেত্রে সুদহার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ ও আমানতের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, সুদহার বাড়ানো নিয়ে তারা আপাতত নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। কিন্তু জ্বালানির মতো করে আকস্মিক সুদহার বেড়ে গেলে দেশের ব্যবসাখাতে বিরূপ প্রভাব পড়বে-এ কথা বলাবাহুল্য।

এক্ষেত্রে আইএমএফের যুক্তি হচ্ছে, ব্যাংক বেশি টাকা পাবে, জনগণ কম ঋণ নেবে। ঋণ কম নেয়ায় খরচ কম করবে সাধারণ মানুষ। এতে বাজারে কমে যাবে চাহিদা, চাহিদার বিপরীতে জোগান কমে এলে পণ্যের দাম কমে আসবে। ফলে বাজারে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে। অর্থনীতির ভাষায় এটিকে বলা হয় নেতিবাচকভাবে অর্থনীতিকে শ্লথ করে দিয়ে বাজার সামলানো, যা উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য বিপজ্জনক।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রয়েছেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, যাদের বিনিয়োগের মূল পুঁজির জোগান আসে ব্যাংক ঋণ থেকে। এক্ষেত্রে সুদহার বেড়ে গেলে ব্যবসায়ীরা ঋণের টাকা মেটাতে হিমশিম খাবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসাখাত। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গিয়ে বাজারে টিকে থাকতে পারবেন না। এতে বেড়ে যাবে বেকারত্বের হার, কর্মহীন হয়ে পড়বে অনেক মানুষ, বাজারে বাড়বে একচেটিয়া মুনাফালোভী কোম্পানি, জনগণ হয়ে পড়বে জিম্মি।

IMF এর শর্ত মেনে বিপদে পড়েছিলো যেসব দেশ—

১৯৭০ সালে আরব বিশ্বের দেয়া তেল নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশ। সে সময় আফ্রিকার দেশগুলোতে রফতানি আয়ের বিপরীতে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায় বহুগুণ। দেশের বাজার মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় আকাশচুম্বী। অর্থনীতিতে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সে সময়

আফ্রিকার দেশগুলো আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে অযৌক্তিক সব শর্ত মেনে, কোনো ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ না করে ঋণ গ্রহণ করে। ১০ বছরের মধ্যে আইএমএফের ঋণের বিরূপ প্রভাব পড়তে থাকে আফ্রিকার দেশগুলোর ওপর। সমস্যা কমানোর চেয়ে বরং বেড়ে যায়, দেশীয় বাজার হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল। ১৯৮০-৯০ এই ১০ বছরকে আফ্রিকায় বলা হয় 'লস্ট ডিকেড' অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া ১০টি বছর।

আইএমএফের শর্ত মেনে আফ্রিকার সরকার তাদের বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়। এতে বাজারে সৃষ্টি হয় 'মনোপলি' (একচেটিয়া ব্যবসা)। অন্যদিকে আইএমএফের আরেক শর্ত ছিল বাজারকে বাজারের মতো চলতে দেয়া (মার্কেট লিবারেলাইজিং)। এটি মানতে গিয়ে বাজারে দেখা দেয় মারাত্মক মূল্যস্ফীতি। পরবর্তী সময়ে মূল্যস্ফীতি প্রকট আকার ধারণ করলেও সরকার আইএমএফের কথা মেনে সুদহার বাড়িয়ে দিলে দেশে দেশে দেখা দেয় অর্থনৈতিক মন্দা।

অর্থনীতির পাশাপাশি মানবিক অধিকার লঙ্ঘনেও পরোক্ষভাবে সমর্থন দেয় আইএমএফ। আফ্রিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালি দেশ আইভোরি কোস্ট কোকো রফতানিতে শীর্ষস্থানে ছিল। বিশ্বের ৪৩ শতাংশ কোকো রফতানি হতো আইভোরি কোস্ট থেকে। কোকো কোম্পানিগুলোকে প্রাইভেটাইজেশন (বেসরকারিকরণ) করা হলে, কোম্পানিগুলো নামমাত্র মজুরিতে শিশু শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করে। এতে যেখানে সংকটের সময় ১৯৮৮ সালে আইভোরি কোস্টের দারিদ্র্যের হার ছিল ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ, ঋণের শর্ত মানতে গিয়ে ১৯৯৫ সালে সে হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭ শতাংশে। দেশটিতে রফতানি বাড়লেও কমে যায় জিডিপি ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। (সূত্র: লেবার রাইট)

আফ্রিকার আরেক দেশ সেনেগাল প্রথমবারের মতো আইএমএফ থেকে ঋণ নেয় ১৯৮৪ সালে। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী দেশটির প্রধান একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হলে এক ধাক্কায় কাজ হারায় ৫ হাজার মানুষ। সে সময় দেশটিতে ৪০ শতাংশ ভর্তুকি কমিয়ে দিলে বেড়ে যায় প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম। একদিকে দেশ সামাল দেয়া, অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা। এমন অবস্থায় ২০০০ সালের সেনেগালের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, দেশটির জিডিপির ৭১ দশমিক ৩ শতাংশই হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। আইএমএফ থেকে ১৯৮৪ সালে ঋণ নেয়ার পরও ২০০০ সালে এসে সেনেগালকে 'চরম দেনাগ্রস্ত গরিব দেশ' (এইচআইপিসি) তকমা নিতে বাধ্য হতে হয়। বলা হয়ে থাকে, আইএমএফের শর্ত মানতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে সেনেগাল। (সূত্র: আইবিআইডি)

■ **Dollar System:** বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে একটি ডলার-কেন্দ্রিক মুদ্রাব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো ঋণ,সুদ (Riba) ও কৃত্রিম অর্থসৃষ্টির (Fiat Money Creation) চক্র।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটি এক ধরনের রিবা-ভিত্তিক আধিপত্যমূলক কাঠামো (Riba-Based Global Dominance)।

ডলার সিস্টেম হলো এমন একটি বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামো যেখানে মার্কিন ডলারকে আন্তর্জাতিক লেনদেন, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এবং বৈশ্বিক ঋণের কেন্দ্রীয় মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুরো বিশ্ব তেল, কাঁচামাল, আমদানি-রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক পরিশোধ—ডলারের ওপর নির্ভর করে চলার ফলে ডলার বিশ্ব অর্থনীতির “Master Key” হিসেবে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Federal Reserve) ডলার তৈরি করে, এবং সেই ডলার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবাহিত হয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেহেতু অধিকাংশ দেশকেই আমদানি-রপ্তানির জন্য ডলার প্রয়োজন, তাই তারা ডলার রিজার্ভ জমা রাখে এবং নিরাপদ সম্পদ হিসেবে মার্কিন সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করে। এসব বন্ডে সুদ রয়েছে; ফলে দেশগুলো ডলার ধরে রাখতে বাধ্য হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র সুদ আয় করে। ডলারের সুদের হার বাড়লে বা কমলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে বৈশ্বিক বাজার, মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যের দামে।

সুদের সাথে ডলার সিস্টেমের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডলার ধরে রাখা মানেই মার্কিন বন্ডে বিনিয়োগ করা, আর মার্কিন বন্ড পুরোপুরি সুদের ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ ডলারসিস্টেমের মূল শক্তি হলো এই সুদ-নির্ভর ঋণচক্র। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়ালে ডলারের মান বেড়ে যায়, বিশ্বে ঋণের খরচ বাড়ে, আর দরিদ্র দেশগুলো আরও বেশি ঋণচাপে পড়ে। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটি এক ধরনের বৈশ্বিক রিবা-নির্ভর আধিপত্য, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র কাণ্ডজে অর্থ সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে এবং সে ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সুদ বা রিবার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

■ **NGO:** NGO হলো 'Non-Government Organization' বা বেসরকারি সংস্থা যা সরকার-

নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় এবং অলাভজনক উদ্দেশ্যে কাজ করে।

বলা হয়ে থাকে, এই সংস্থাগুলো সাধারণত সামাজিক উন্নয়ন, অধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করে থাকে।

এনজিওর আরেকটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো– ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দেয়া। ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে সামান্য পরিমাণ ঋণ। বেকার, দরিদ্র উদ্যোক্তা ও সাধারণ দরিদ্র, এমন জনগোষ্ঠী যারা ব্যাংক থেকে ঋণ পান না; তাদের সহজশর্তে বিনা জামানতে এই ঋণ দেওয়া হয়। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন-২০০৬-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে ‘দারিদ্র্যবিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা’।

ব্র্যাক(BRAC),প্রশিক্ষণ,আশা,প্রশিকা,গ্রামীণ ব্যাংক,প্রত্যাশী,মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, কোস্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,সূর্যের হাসি নেটওয়ার্ক, সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট(শেড) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অসংখ্য এনজিও রয়েছে বাংলাদেশে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর মতো সংস্থাগুলো এনজিও কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক এনজিও-র মধ্যে রয়েছে— অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রেড ক্রস,অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি যারা বিশ্বজুড়ে কাজ করে থাকে।

NGO-র ভাষ্যমতে যেসকল সামাজিক সুবিধার কথা তারা বলে থাকে—

- সামাজিক পরিবর্তন: এনজিওগুলো নীতি ও আইনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে।
- প্রয়োজনীয় সেবা: অভাবগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্য সরবরাহ করে।
- জনগণের জন্য কাজ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য চ্যালেঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করে।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: সরকারি অনুদান ও ব্যক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
- বিশেষায়িত কার্যক্রম: সরকারি সংস্থার বিপরীতে এনজিও নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি বিষয়ে মনোনিবেশ করে, যা তাদের ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে এবং কার্যকর সমাধান তৈরি করতে সাহায্য করে।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন: সরকার ও সমাজের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে।
- নারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ: কিছু এনজিওতে নারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকে।

এ পর্যন্ত পড়ে পাঠকরা আশান্বিত হতে পারেন এই ভেবে যে, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো কত না সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এর নেপথ্যে কত যে করুণ ইতিহাস রচিত হচ্ছে, তার হিসাব কেউ রাখেন না।

'প্রতিদিনের সংবাদ' পত্রিকার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী— "এনজিও ঋণের বেড়াজালে ১৪ কোটি মানুষ।" এসব গরিব মানুষ তাদের পারিবারিক প্রয়োজনেই এনজিও সমিতির ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কিছু বাড়তি আয় করে ঋণ পরিশোধের চিন্তা থাকে। লক্ষ্য থাকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করার। কেউ কেউ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করে। অনেকে রিকশা-ভ্যান কিনে আবার চাষাবাদও করে। কিন্তু নিত্য অভাবের সংসারে বর্ধিত দামের খাবার কিনতেই বেশ কিছু টাকা খরচ হয়। সন্তানের লেখাপড়াতেও টাকা খরচ হয়। অনেক সময় চিকিৎসার জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয় হয়ে যায়। এ ছাড়া আছে বিয়ে ও উৎসব পালনের খরচ। এভাবে ঋণের টাকা যখন তলানিতে ঠেকে, তখন আর একটি সমিতি থেকে ঋণ নিতে হয়। আর তা পরিশোধের জন্য পরিবারের সবাইকে রাত-দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। যারা বা যাদের সন্তান অন্যত্র চাকরি করে, তারা সমিতির কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে পারে। অন্যদের জন্য জুলুম হয়ে যায়। এর পরও এনজিও ঋণ নিতেই হয়। কারণ হতদরিদ্র মানুষগুলো নিয়মিত প্রয়োজনীয় আয় করতে পারে না। আবার কোনো ব্যাংকও তাদের টাকা দেয় না।

এনজিওগুলোর জন্ম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নামে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কেউ এখন আর স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে না। এনজিওগুলো যে ঋণ বিতরণ করে তার সুদের হার এত বেশি যে, কেউ একবার নিলে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে আর তা শোধ করতে পারে না। একসময় ক্ষুদ্রঋণদানকারী

সংস্থাগুলো ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হারে সুদ নিত। ক্ষুদ্রঋণের উচ্চসুদের হার নিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার ২০১০ সালে সুদের হার ২৭ শতাংশ বেঁধে দেয়। উচ্চহারে সুদ নিয়ে এনজিও নামে পরিচিত ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থাগুলো দ্রুতই উন্নতি করেছে। কিন্তু ঋণগ্রহীতাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে, সারা দেশে এমআরএ নিবন্ধিত প্রায় ৮৮১টি ক্ষুদ্রঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৭৪৭টি প্রতিষ্ঠান প্রায় ২২ হাজার শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ঋণ আদায়ের হার ৯৮ ভাগের বেশি। দেশের তিন কোটি ৫২ লাখের বেশি পরিবার ক্ষুদ্রঋণের আওতায় রয়েছে। পরিবার প্রতি গড়ে চারজন ধরা হলে প্রায় ১৪ কোটি মানুষ অর্থাৎ, দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্রঋণে সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০১৭ সালের ১৯ জুন এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের সভায় কমিটির সুপারিশের আলোকে এনজিও ঋণের সুদের হার ২৪ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পায়। এমআরএর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৯৯টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১০ লাখের বেশি ঋণগ্রহীতা রয়েছে ব্র্যাক ও আশার। ক্ষুদ্রঋণের উল্লেখযোগ্য অংশের জোগানদার পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)। এই সংস্থা থেকে এনজিওগুলো মাত্র ৪ থেকে ৬ শতাংশ হারে ঋণ পেয়ে থাকে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তথা এনজিওগুলো গরিব মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সুদ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। তিনি বলেন, ‘এত বেশি সুদ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সেবা করার জন্য এনজিও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, তবে কেন এত উচ্চ চার্জ নেওয়া হয়?’ গত বছর ১৫ নভেম্বর মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (MRA) ই- সেবা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের এনজিওগুলো প্রতিনিয়ত শ্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। সরকার তাদের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই অবহিত। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়নের নামে মানুষকে তার সুকোমল বৃত্তি থেকে দূরে সরিয়ে তাকে টাউট হিসেবে তৈরি করছে। মূলত তারা ঋণ আর সুদের ব্যবসা করছে। সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নাম করে তারা মূলত গরিব অসহায় মানুষের রক্তচোষে থাকে। কার্যত সুদের দায় মাথায় নেয়া ছাড়া গরিবের হালতের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। তবুও দিনশেষে এসব নির্লজ্জ, অমানবিক কিংবা পাশবিক দায়িত্বশীল গরিবের রক্তচোষা এনজিও মালিকরা

বুলি আওড়ায় মানবতার, সমাজসেবার কিংবা দারিদ্র বিমোচনের। তাদের মুখরোচক বক্তব্যে বলা হয়, "আমাদেরকে মানুষের মঙ্গল ও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এরজন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। শুধু নিজেদের কথা ভাবলে হবে না, ভাবতে হবে সমাজের কথা, হতদরিদ্র মানুষের কথা।"

■ মুক্তবাজার অর্থনীতি(Free Market Economy): মুক্ত বাজার হল এমন একটি

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য ও পরিষেবার দাম নির্ধারিত হয় এবং এতে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না বা খুব কম থাকে। এই ব্যবস্থায়, ক্রেতা ও বিক্রেতারাই তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লেনদেন করে এবং মূল্য নির্ধারণে স্বাধীন থাকে। এর ফলে প্রতিযোগিতা বাড়ে, দাম কমে এবং মান উন্নত হয়।

Free Market বা মুক্ত বাজার সুদের সাথে সম্পৃক্ততা কিভাবে?

মুক্ত বাজার ও সুদের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে মুক্ত বাজারে সুদ (interest) একটি মূল্যের মতো কাজ করে, যা ঋণ এবং বিনিয়োগের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে একটি লেনদেনকে উৎসাহিত করে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে, সুদ হল অর্থের সময়মূল্য (time value of money) নির্ধারণের একটি ব্যবস্থা, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির জন্য বর্তমান ত্যাগ স্বীকার করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট মূল্যে প্রদান করা হয়, যা সরবরাহ এবং চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মুক্ত বাজারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নীতিগতভাবে চাহিদা-জোগান, প্রতিযোগিতা ও মূল্যস্বাধীনতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এই বাজারও সুদের প্রভাবমুক্ত নয়—কারণ বিনিয়োগের মূল উৎসই হলো সুদযুক্ত পুঁজি। ব্যাংক, বন্ড মার্কেট ও আন্তর্জাতিক লোন সুদের ভিত্তিতে কাজ করায় উৎপাদন, মূল্য, এমনকি ব্যবসার বিস্তারও সুদের হারের ওঠানামার সাথে ওঠানামা করে। সুদের হার বাড়লে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ কমায়, বাজার সংকুচিত হয়; সুদ কমলে উল্টোভাবে বাজার সক্রিয় হয়। ফলে মুক্ত বাজার তত্ত্বগতভাবে স্বাধীন হলেও এর কার্যকারিতা বৈশ্বিক সুদনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

মুক্ত বাজারে সুদের ভূমিকা—

- **অর্থের সময়মূল্য:** মুক্ত বাজারে, সুদ হল অর্থের সময়মূল্যের একটি পরিমাপ। যিনি আজকে টাকা ধার দেন, তিনি ভবিষ্যতের জন্য তার অর্থের ব্যবহার ত্যাগ করেন, এবং সুদ হল সেই ত্যাগের জন্য ক্ষতিপূরণ।
- **বিনিয়োগ ও সঞ্চয়:** মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে, সুদ সঞ্চয়কারী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। যখন একজন ব্যক্তি টাকা ধার দেয়, তখন সে সুদের আকারে একটি অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশা করে, যা তাকে সঞ্চয় করতে বা বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে।
- **ঋণ ও বিনিয়োগের ভারসাম্য:** মুক্ত বাজারে সুদ সুদের হার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ঋণ এবং বিনিয়োগের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করে। সুদের হার যখন বেশি থাকে, তখন মানুষ সঞ্চয় করতে বেশি আগ্রহী হয় এবং ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হয়, অন্যদিকে সুদের হার কম থাকলে মানুষ ঋণ নিতে বেশি আগ্রহী হয় এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- **বাজারের কার্যকারিতা:** মুক্ত বাজারে, সুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসেবে কাজ করে। সুদের হার যখন বেশি থাকে, তখন তা অর্থায়নের ব্যয় বাড়ায় এবং যখন কম থাকে, তখন তা ব্যয় কমায়, যা বাজারের চাহিদা এবং সরবরাহের উপর প্রভাব ফেলে।

এসব কারণে মুক্ত বাজারের “স্বাধীন প্রতিযোগিতা” আসলে সুদনির্ধারিত মূলধনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইসলামী দৃষ্টিতে এটি বাজারে অপ্রাকৃত চাপ ও বৈষম্য তৈরি করে, যা প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যকে সীমিত করে।

■ উন্মুক্ত অর্থনীতি (Open Economy):

একটি দেশীয় অর্থনীতি যা অন্যান্য দেশের সাথে অবাধে পণ্য, পরিষেবা এবং পুঁজি বিনিময় করে। অর্থাৎ, একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে অন্য দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য ও অর্থায়নের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

- এটি মুক্তবাজার অর্থনীতির একটি সম্প্রসারিত রূপ, যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সম্পর্ক থাকে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের অনুমতি দেয়।
- প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বিনিময় করতে পারে।
- রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নেয়।

- একটি দেশের মোট আয় ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় এবং নিট রপ্তানির সমষ্টি।

উন্মুক্ত অর্থনীতিতে সুদ জড়িত কারণ—

উন্মুক্ত অর্থনীতি মূলত পণ্য, সেবা ও মূলধনের স্বাধীন প্রবাহের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারের সাথে সংযুক্ত থাকার ধারণা। কিন্তু এই সংযোগের কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে সুদ—যা আন্তর্জাতিক বন্ড, বৈদেশিক ঋণ, ফান্ড ফ্লো এবং বৈশ্বিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুদের হারের সামান্য পরিবর্তনও আমদানি ব্যয়, মুদ্রার মান, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাজেট ঘাটতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ফলে উন্মুক্ত অর্থনীতিতে নীতিনির্ধারণ অনেকটাই বৈশ্বিক সুদনীতির ওঠানামার কাছে বাধ্য হয়ে পড়ে। ইসলামী দৃষ্টিতে এটি অর্থনৈতিক অসাম্য ও শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে টেকসই ন্যায্যতার ভিত্তি নষ্ট করে দেয়।

সুদের হার নির্ধারণ করে— পুঁজির আগমন-প্রস্থান, মুদ্রার মান, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ভারসাম্য। অর্থাৎ, সুদের হার বাড়লে বিদেশি পুঁজি আসে ও মুদ্রা শক্তিশালী হয়; কমলে পুঁজি বেরিয়ে যায় ও মুদ্রা দুর্বল হয়। তাই সুদ আন্তর্জাতিক লেনদেন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

সুদের প্রভাব—

১. সুদের হার বেড়ে গেলে দেশীয় বিনিয়োগ কমে যায়।
২. বিদেশি পুঁজি প্রবাহ বেশি হলে দেশ বিদেশি নির্ভর হয়ে পড়ে।
৩. সুদের পরিবর্তনে মুদ্রার মান ওঠানামা করে, ফলে রপ্তানি খাতে অস্থিরতা দেখা দেয়।
৪. পুঁজির দ্রুত আগমন-প্রস্থান অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।
৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ বিদেশি সুদের হারেও নির্ভর করতে হয়।

এভাবে উন্মুক্ত অর্থনীতি বাহ্যিক ঋণ ও সুদনির্ভর পুঁজির ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে যায় যে নিজস্ব অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বও সংকুচিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ দেশগুলো বৈশ্বিক সুদের চক্রে আটকে গিয়ে নীতিগতভাবে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারায়।

■ **ক্রেডিট কার্ড:** ক্রেডিট কার্ড হলো এক ধরনের ঋণ। এটি একটি প্লাস্টিক কার্ড যা ব্যাংক বা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয় এবং এটি ব্যবহার করে গ্রাহক একটি পূর্বনির্ধারিত সীমা পর্যন্ত

ঋণ হিসেবে অর্থ ব্যবহার করে কেনাকাটা করতে পারেন। এই কেনাকাটার টাকা পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। প্রতিটি ক্রেডিট কার্ডের একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা থাকে। এটি আপনার আয় এবং আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। যদি আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করেন, তাহলে আপনাকে অতিরিক্ত সুদ দিতে হতে পারে।

- ক্রেডিট কার্ডে সুদ হলো একটি অতিরিক্ত ফি যা ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী সংস্থাকে দিতে হয়, যখন বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব হয় অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা না হয়। ক্রেডিট কার্ড একটি অসুরক্ষিত ঋণপত্র হওয়ায়, এটি পরিশোধ না করলে ব্যাংক জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারে না। ক্রেডিট কার্ডে সুদ, বকেয়া অর্থের উপর নির্ধারিত হারে প্রযোজ্য হয় এবং এটি ব্যাংকগুলির রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস। যদি আপনি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিল পরিশোধ না করেন, তাহলে বকেয়া অর্থের উপর সুদ আরোপ করা হয়।
- ক্রেডিট কার্ড থেকে নগদ টাকা তুললে সঙ্গে সঙ্গে সুদ প্রযোজ্য হয় এবং সুদমুক্ত সুবিধা বাতিল হয়ে যায়।
- অতিরিক্ত খরচ করলে এবং বিল পরিশোধে বিলম্ব করলে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ঋণগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
- কিছু অফার, যেমন 'বাই নাই পে লেটার' (buy now pay later) বা খরচহীন ইএমআই (EMI)-এর ক্ষেত্রে লুকানো চার্জ ও যৌগিক সুদের কারণে খরচ বাড়তে পারে।

ক্রেডিট কার্ড হারাম কারণ—

প্রচলিত ক্রেডিট কার্ড সাধারণত হারাম, কারণ এতে সুদ (রিবা) যুক্ত করার শর্ত থাকে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। বেশিরভাগ প্রচলিত ক্রেডিট কার্ডে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরো বকেয়া পরিশোধ না করলে সুদ বা জরিমানা দিতে হয়। এই সুদ বা রিবা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কার্ড নেওয়ার সময় আপনি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন যেখানে সুদের শর্তটি উল্লেখ থাকে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা মানে একটি সুদী লেনদেনের অংশ হওয়া, যা হারাম।

■ **DPS:** DPS বা Deposit Pension Scheme আসলে একটি সঞ্চয়ভিত্তিক স্কিম, যেখানে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় ধরে মাসিক কিস্তি জমা দেয় এবং মেয়াদ শেষে ব্যাংক সেই সঞ্চয়ের ওপর সুদ বা মুনাফা যোগ করে মোট টাকা ফিরিয়ে দেয়। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় DPS-এর লাভ সরাসরি সুদের হিসাবেই নির্ধারিত হয়, তাই এটি সুদনির্ভর সঞ্চয়ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। সুদের এই কাঠামো ব্যক্তি সঞ্চয়কে ব্যাংকিং সুদচক্রের সাথে যুক্ত করে দিয়ে পুরো অর্থনীতিতে সুদনির্ভরতা বাড়ায়। ইসলামী দৃষ্টিতে এই সুদ কমপোনেন্ট রিবার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রচলিত DPS গ্রহণকে ইসলাম সমর্থন করে না।

ডিপিএস-এর ক্ষেত্রে সুদের হার ব্যাংক, স্কিমের মেয়াদ এবং জমা করা টাকার পরিমাণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তাই লাভ হিসাব করার সময় সুদের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

DPS-এর মাধ্যমে মানুষ মূলত নিরাপদ এবং নিশ্চিত আয় আশা করে, কিন্তু এই “নিশ্চিত আয়” প্রায়ই সুদের ওপর নির্ভরশীল। এতে ব্যক্তি শুধু সঞ্চয় নয়, ব্যাংকের সুদচক্রের অংশ হয়ে যায়, যা অর্থনীতিতে সুদনির্ভরতার বিস্তার ঘটায়। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি DPS-এর ক্ষেত্রে সুদ বৃদ্ধি বা হ্রাস গ্রাহকের আয়কে সরাসরি প্রভাবিত করে, ফলে ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনাও সুদের ওঠানামার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে DPS সাধারণ মানুষের দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়কেও সুদের গণিতের ভেতরে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে DPS শুধুমাত্র সঞ্চয় উপায় নয়, বরং সুদনির্ভর অর্থনৈতিক চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে। এভাবেই ব্যক্তি পর্যায়ের সঞ্চয়ও শেষ পর্যন্ত সুদনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

■ **সার্বজনীন পেনশন স্কিম:** সার্বজনীন পেনশন স্কিম হলো একটি সরকারি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিককে একটি নির্দিষ্ট বয়স থেকে অবসরের পর আজীবন পেনশন সুবিধা দেওয়া হয়। এই স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী নাগরিকরা ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকরা ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা দিয়ে আজীবন পেনশন পেতে পারেন। এই স্কিমের উদ্দেশ্য হলো দেশের নাগরিকদের অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা।

নিম্নে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বজনীন পেনশন স্কিমের সুদ সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরা হল—

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী, বর্তমানে মানুষের আয়ুষ্কাল ৭২.৪ বছর। এ হিসাবে ধরে নেই একজন লোক সাধারণত ৭২ বছর আয়ু পায়। ধরা যাক, ‘প্রগতি’ স্কিম অনুযায়ী কেউ ৫০ বছর বয়সে স্কিম চালু করলো। তাহলে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে ১০ বছরে তাকে চাঁদা দিতে হবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ৬০ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে সে পেনশন পাবে ৩০৬০ টাকা করে। তাহলে ১৫ বছরে সে এবং তার নমিনীর সম্ভাব্য প্রাপ্তি হবে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত টাকা। একইভাবে ‘সুরক্ষা’ স্কিমে মাসে ১ হাজার করে ১০ বছরে চাঁদা দিবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। বিপরীতে ১৫ বছরে সম্ভাব্য ন্যূনতম প্রাপ্তি দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪ শত টাকা।

অনুরূপ ‘প্রবাসী’ স্কিমে ১০ বছরে ৬ লক্ষ টাকা চাঁদা দিলে ৬০ বছর পর সে এবং তার নমিনীর ন্যূনতম প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৮০ টাকা। এখানে প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং পেনশন শুরু হওয়ার (৬০ বছরের আগে) কেউ মারা গেলে জমাকৃত টাকা মুনাফা সহ পাবে। মুনাফার হার উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতীয়মান হয় যে, চাঁদা দাতা যে পরিমাণ সঞ্চয় করবে সব অবস্থাতেই মুনাফা সহ অর্থ ফেরত পাবে। এখানে অর্থের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে সেটাই সুদ। একই বস্তুতে যা অতিরিক্ত আনয়ন করে তাই সুদ।

■ বন্ড-ডিবেঞ্চার:

বন্ড (Bond):

বন্ড হলো একটি ঋণপত্র, যেখানে একজন বিনিয়োগকারী সরকার বা কোনো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ ধার দেয়। এর বিনিময়ে বন্ড-ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বন্ডধারীকে একটি নির্ধারিত সুদের হার (Coupon Rate) প্রদান করতে বাধ্য থাকে। মেয়াদপূর্তিতে মূল টাকা ফেরত দেয়। তাই বন্ড মূলত সুদ-নির্ভর ফিক্সড ইনকাম ইনস্ট্রুমেন্ট।

কিভাবে সুদের সাথে জড়িত?

- বন্ড ইস্যুর সময়ই নির্ধারিত থাকে কত শতাংশ সুদ দেওয়া হবে।
- বিনিয়োগকারীর লাভ সম্পূর্ণভাবে সুদভিত্তিক, যা ইসলামী শরীয়ায় রিবা হিসেবে গণ্য।

- বাজারে বন্ডের দাম ওঠানামাও হয় সুদের হারের পরিবর্তনের ওপর (Interest Rate Sensitivity)।

ডিবেঞ্চর (Debenture):

ডিবেঞ্চরও এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র, তবে এটি সাধারণত অনিরাপদ (Unsecured) হয়—অর্থাৎ এর পেছনে নির্দিষ্ট কোনো সম্পদ জামানত থাকে না। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা ও সুনামের ওপর ভিত্তি করে ইস্যু করা হয়। ডিবেঞ্চরধারীকেও নির্দিষ্ট সুদ প্রদান করা হয়।

কিভাবে সুদের সাথে জড়িত?

- ডিবেঞ্চরের আয়ও মূলত নির্দিষ্ট সুদের ওপর ভিত্তি করে।
- প্রতিষ্ঠান তাদের ঋণের বিনিময়ে নির্ধারিত হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকে।
- এর ঝুঁকি বেশি, তাই সুদের হারও সাধারণত তুলনামূলক বেশি নির্ধারিত হয়।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে— বন্ড বা ডিবেঞ্চর উভয়ই “Pre-Determined Fixed Interest” এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত। অর্থাৎ মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি (রিবা) শর্তায়িত থাকে। ইসলামী শরীয়ায় এই ধরনের শর্তযুক্ত অতিরিক্ত আয়ের চুক্তি স্পষ্টভাবে রিবা বলে পরিগণিত, তাই নিষিদ্ধ।

■ বীমা (Insurance):

বীমা হলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি, যেখানে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম (Premium) প্রদান করে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে আর্থিক সুরক্ষা লাভ করে। বীমা কোম্পানি ঝুঁকি সংগ্রহ করে (Risk Pooling) এবং ভবিষ্যতে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেয়।

বীমা কীভাবে সুদের সাথে সম্পর্কিত?

১. প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণের মধ্যে অনিশ্চিত পার্থক্য: বীমা চুক্তিতে একজন বীমাগ্রহীতা কম প্রিমিয়াম দিয়ে বিপরীতে অনেক বেশি অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে—এটি নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থ, যা রিবার একধরনের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

২. বীমা কোম্পানির বিনিয়োগ ব্যবস্থা সুদভিত্তিক: জীবনবীমা ও সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের প্রিমিয়াম সাধারণত সুদভিত্তিক বন্ড, ট্রেজারি বিল, ব্যাংক ডিপোজিট ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ বীমা কোম্পানির আয় কাঠামো সুদ-নির্ভর (Interest-Based Portfolio)।

৩. বীমার গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন (Guaranteed Return): বিশেষ করে জীবনবীমায় নির্দিষ্ট সময়ের শেষে নির্ধারিত পরিমাণ বৃদ্ধি (Fixed Growth / Fixed Return) দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট মূলধনের ওপর শর্তযুক্ত বৃদ্ধি—ইসলামী আইন অনুযায়ী এটি রিবা।

৪. চুক্তিতে অনিশ্চয়তা (Gharar) সুদভিত্তিক ফলাফলে পরিণত হয়: বীমা চুক্তিতে ঝুঁকি, সময় ও অর্থের পরিমাণ অনিশ্চিত থাকে। এই অনিশ্চয়তা (Gharar) শেষ পর্যন্ত সুদ-ধর্মী আয়ের দিকে নিয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ—

- বীমায় রিবা (সুদ),
- গারার (অনিশ্চয়তা), এবং
- মাইসির (জুয়া সদৃশ ঝুঁকি বিনিময়)

এই তিন উপাদানের কারণে প্রচলিত বীমা ইসলামিক শরীয়ায় অবৈধ বিবেচিত।

■ স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange):

স্টক এক্সচেঞ্জ হলো একটি সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত বাজার যেখানে স্টকব্রোকার ও ব্যবসায়ীরা কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ও অন্যান্য আর্থিক সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করতে পারেন। এটি একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম, যা বিনিয়োগকারীদের শেয়ার কেনাবেচা করার সুযোগ দেয় এবং কোম্পানিগুলোর তহবিল সংগ্রহের সুযোগ করে দেয়।

স্টক এক্সচেঞ্জ সরাসরি নিজে সুদ নয়। কিন্তু কোম্পানির সুদনির্ভর ফাইন্যান্সিং, বাজারের সুদ-সংবেদনশীল মূল্যায়ন, মার্জিন লোন, শর্ট সেলিং ও সুদভিত্তিক সিকিউরিটিজের কারণে পুরো ব্যবস্থায় সুদের প্রভাব বিদ্যমান।

স্টক এক্সচেঞ্জ কীভাবে সুদের সাথে জড়িত?

১. কোম্পানির অর্থায়ন সুদনির্ভর: বাজারে তালিকাভুক্ত অধিকাংশ কোম্পানি— ব্যাংক ঋণ, বন্ড ইস্যু, সুদযুক্ত কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং ব্যবহার করে। তাদের মুনাফায় সুদের উপার্জন যোগ হয়। শেয়ারহোল্ডারও পরোক্ষভাবে সুদ থেকে আয় পায়।

২. সুদের হারই শেয়ার দামের মূল চালিকা শক্তি: স্টক মার্কেটের মূল্যায়নে সুদের হার একটি ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবল। সুদের হার বাড়লে—কোম্পানির মূলধন ব্যয় বাড়ে, লাভ কমে, শেয়ার দাম পড়ে। সুদের হার কমলে—বিনিয়োগের চাপ বাড়ে, শেয়ার দাম বাড়ে।

অর্থাৎ, মার্কেট *interest-sensitive*।

৩. মার্জিন ট্রেডিং সরাসরি সুদ-শর্তযুক্ত: বিনিয়োগকারী ব্রোকারের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে শেয়ার কেনে এর বিপরীতে সুদ/ইন্টারেস্ট দিতে হয়। এটি সরাসরি রিবা-আধারিত লেনদেন।

৪. শর্ট সেলিং ও ডেরিভেটিভস সুদ-সংশ্লিষ্ট মডেলে মূল্যায়িত:

- শর্ট সেলিং: শেয়ার ধার নেওয়া হয়, পরবর্তীতে ফেরত দিতে হয়—ঋণ সদৃশ চুক্তি।
- ডেরিভেটিভস (futures, options): মূল্য নির্ধারণে ইন্টারেস্ট রেট ডিসকাউন্টিং, Black-Scholes, CAPM ইত্যাদি সুদনির্ভর মডেল ব্যবহৃত হয়।

৫. স্টক এক্সচেঞ্জ নিজেও সুদভিত্তিক ইনস্ট্রুমেন্ট লেনদেন করে: এক্সচেঞ্জে শুধু শেয়ার নয়—ট্রেজারি বিল, কর্পোরেট বন্ড, ডিবেঞ্চার এ ধরনের সরাসরি সুদযুক্ত সিকিউরিটিজও ট্রেড হয়।

এছাড়াও, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) সরাসরি স্টক এক্সচেঞ্জের আয় থেকে প্রাপ্ত সুদের একটি অংশ ‘Stock Exchange Investors Protection Fund’-এ জমা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দেয়।

■ প্রচলিত সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা:

আজকের প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত সুদনির্ভর (Interest-based)। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

1. ঋণ ও ডিপোজিট: ব্যাংক গ্রাহকের টাকা ধার নেয় বা ঋণ দেয়, এবং এই লেনদেনে সুদ আরোপ করা হয়।
2. সঞ্চয় ও ঋণচক্র: গ্রাহকের সঞ্চয়ও ব্যাংক সুদের মাধ্যমে ব্যবহার হয়; ফলে অর্থনীতিতে সুদ চক্র বজায় থাকে।
3. মুদ্রানীতি ও সুদ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার দিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে।
4. আর্থিক প্রভাব: উচ্চ সুদ বিনিয়োগ কমায়, উৎপাদন ব্যাহত করে এবং সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

সংক্ষেপে: প্রচলিত সুদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও আর্থিক লেনদেনের মূল ভিত্তি, যা ব্যক্তিগত, কর্পোরেট এবং জাতীয় অর্থনীতিকে সুদনির্ভর করে তোলে।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিস্তারিত কার্যক্রম সম্পর্কে জানবো।

■ **কেন্দ্রীয় ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা দেশের মুদ্রা, অর্থ সরবরাহ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমগ্র ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

সহজভাবে বলতে গেলে— একটি দেশের মুদ্রানীতি পরিচালনা, অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত তদারকি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত আর্থিক কর্তৃপক্ষ। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির কেন্দ্রে থাকে সুদহার, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে সুদের সাথে জড়িত?

১. নীতি সুদহার নির্ধারণ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতির জন্য একটি নীতিসুদহার বা পলিসি রেট (যেমন রেপো রেট, ব্যাংক রেট) নির্ধারণ করে। এই হারই পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার ঋণ ও আমানতের সুদহারকে নির্দেশনা দেয়। সুদের হার কমানো বা বাড়ানোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতিকে উত্তেজিত বা শীতল করতে পারে।

২. বাজারে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ:

Open Market Operation নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি বন্ড কিনে বা বিক্রি করে বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়ায় বা কমায়। এই বন্ডগুলো সুদভিত্তিক হওয়ায় পুরো প্রক্রিয়াটি সুদের মাধ্যমে অর্থনীতিকে পরিচালনা করে।

৩. ব্যাংক ঋণ নীতি নির্ধারণ:

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং এই ঋণের ওপর সুদ দিতে হয়। ফলে ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষমতা সরাসরি সুদ-নির্ভর হয়ে পড়ে এবং সাধারণ গ্রাহকদের ঋণের সুদের হারও এর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদ ব্যবহার:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়ায়, যাতে ঋণ গ্রহণ কমে, খরচ কমে এবং বাজারে চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থাৎ সুদনীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল মুদ্রানীতির অংশ।

৫. আর্থিক বাজারকে সুদ-সংবেদনশীল করা:

স্টক মার্কেট, বন্ড মার্কেট, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার সকল ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদ সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রভাব ফেলে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগের প্রবণতা কমে, আর কমলে বাড়ে।

অর্থাৎ— কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক অর্থনীতির হৃদয়স্থল, আর সুদ তার প্রধান নীতিগত হাতিয়ার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রায় সব কার্যক্রম অর্থ সরবরাহ, ঋণনীতি, বন্ড ব্যবস্থাপনা, বাজার নিয়ন্ত্রণ সুদ-নির্ভর কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

■ **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত

গ্রহণ করে এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক

ব্যাংক বলে। এই ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে এবং ঋণের উপর বেশি সুদ ধার্য করে মুনাফা অর্জন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সুদ—

- **আমানতকারীদের সুদ:** ব্যাংক গ্রাহকদের জমা রাখা টাকার উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে, যা তাদের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে।

- **ঋণগ্রহীতাদের থেকে প্রাপ্ত সুদ:** ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে এবং সেই ঋণের উপর গ্রাহকদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে।

- **নিট সুদ (আয়ের উৎস):** ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে যে হারে সুদ আদায় করে এবং আমানতকারীদের যে হারে সুদ প্রদান করে, এই দুই হারের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের নিট সুদ। এটিই ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস।

- **সুদের হার:** ঋণের সুদের হার বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন ঋণের ধরন, সম্পত্তির মূল্য এবং ঋণগ্রহীতার ঋণযোগ্যতা।

- **ব্যাংক হার:** এটি হলো সেই সুদ হার, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয় এবং এই হার পরিবর্তিত হতে পারে।

অর্থাৎ— বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের সুদ প্রদান করে এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদ আদায় করে। এই দুই ধরনের সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের মূল আয়, যা তাদের পরিচালনাগত ব্যয় মেটাতে এবং মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মূলত ঋণ দেওয়া ও আমানত গ্রহণ করার মাধ্যমে সুদভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

■ **কৃষি ব্যাংক:** কৃষি ব্যাংক বলতে এমন একটি ব্যাংককে বোঝায় যা মূলত কৃষিখাতে অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। যেমন: বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' (বিকেবি)। এই ধরনের ব্যাংক কৃষকদের ঋণ প্রদান করে এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উন্নয়নে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ বা আমানতের উপর সুদ আরোপ করে। কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের হিসাব এবং ঋণের উপর সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু আমানতের উপর সুদের হার ৯% পর্যন্ত এবং কিছু ঋণের উপর সুদের হার ১০.৭০% পর্যন্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ক্ষেত্রে—

- আমানত: কিছু আমানত, যেমন দৈনিক মুনাফা হিসাব, দৈনিক স্থিতির উপর ৫% হারে সুদ প্রদান করে।
- ঋণ: বিভিন্ন ঋণের উপর সুদের হার পরিবর্তিত হয়। যেমন, কিছু ঋণের উপর সুদের হার ১০.৭০%।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে—

- ঋণ: বিভিন্ন ধরনের কৃষি ঋণের উপর, যেমন শস্য ঋণ, মৎস্য ঋণ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণের উপর সুদের হার ৯%।

অন্যান্য তথ্য—

- সুদের হার ঋণের ধরণ এবং মেয়াদের উপর নির্ভর করে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুদের হার নির্ধারণ করে।
- কিছু ক্ষেত্রে, যেমন কিছু নির্দিষ্ট আমানত প্রকল্পে, ব্যাংক সুদের একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে।

■ **শিল্প ব্যাংক:**

শিল্প ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা শিল্প খাতের উন্নয়নে বিশেষায়িতভাবে কাজ করে। যা দেশের শিল্পায়ন, উৎপাদন খাত, বৃহৎ প্রকল্প, অবকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকে অর্থায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। সাধারণত সরকারি মালিকানাধীন বা সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এসব ব্যাংক শিল্পোন্নয়নে

প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করে থাকে। এসব ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত পরামর্শও দিয়ে থাকে।

শিল্প ব্যাংক কীভাবে সুদের সাথে জড়িত?

১. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুদ ভিত্তিক: শিল্প ব্যাংক সাধারণত বড় শিল্প প্রকল্প, কারখানা, যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এসব ঋণের ওপর নির্ধারিত হারে সুদ আরোপ হয়, যা ব্যাংকের মূল আয়ের উৎস।

২. শিল্প খাতে সুদ-সাবসিডি নীতি: অনেক ক্ষেত্রে সরকার শিল্পায়ন বাড়াতে বিশেষ খাতে কম সুদের হার নির্ধারণ করে বা সুদের একটি অংশ ভর্তুকি দেয়। কিন্তু কাঠামোটি মূলত সুদ-নির্ভর থাকে।

৩. পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) ব্যবস্থায় সুদ: শিল্প ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে কম সুদে তহবিল পায় এবং পরে সেই তহবিল শিল্প উদ্যোক্তাদের বেশি সুদে ঋণ দেয়। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি সুদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

৪. প্রকল্প মূল্যায়ন সুদের হারের উপর নির্ভরশীল: প্রকল্পের আর্থিক সক্ষমতা (feasibility) মূল্যায়নের সময় Discount Rate, Cost of Capital, Interest Coverage Ratio—এসব সূচক ব্যবহার করা হয়, যা সুদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

৫. শিল্প ব্যাংকের মুনাফা সুদ থেকে আসে: শিল্প ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণের সুদ। প্রকল্প সফল হোক বা ব্যর্থ—বাঁধা সুদ ব্যাংক পেতে চায়। এতে লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ধারণা থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্প ব্যাংক যদিও শিল্পায়নের তহবিল সরবরাহ করে, কিন্তু তার অর্থায়ন কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হলো সুদ। ঋণ বিতরণ, প্রকল্প মূল্যায়ন, তহবিল সংগ্রহ ও ব্যাংকের মুনাফা—সবকিছুই সুদ-নির্ভর অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

■ **বিনিয়োগ ব্যাংক:**

বিনিয়োগ ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মূলত বড় কর্পোরেশন, সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সংগ্রহ, শেয়ার-বন্ড ইস্যু, মার্জার-অ্যাকুইজিশন, প্রকল্প বিনিয়োগ এবং আর্থিক পরামর্শ সেবা প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আমানত গ্রহণ নয়; বরং পুঁজিবাজারভিত্তিক কার্যক্রমই এর মূল কাজ।

বিনিয়োগ ব্যাংক কীভাবে সুদের সাথে জড়িত?

১. বন্ড ইস্যু ও বিক্রয়: বিনিয়োগ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো কর্পোরেট বন্ড ও সরকারি বন্ড বাজারজাত করা। বন্ড মূলত সুদভিত্তিক সিকিউরিটি। অর্থাৎ বিনিয়োগ ব্যাংক সরাসরি সুদের অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণের মধ্যস্থতাকারী।

২. ঋণমূলক অর্থায়ন (Debt Financing): বিনিয়োগ ব্যাংক কোম্পানির জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করে দেয় এবং সেই ঋণে সুদ নির্ধারিত থাকে। ফলে বিনিয়োগ ব্যাংকের পরামর্শ ও কাঠামো পুরোপুরি সুদ-নির্ভর হয়ে পড়ে।

৩. লিভারেজড ফাইন্যান্স (Leveraged Finance): বড় কর্পোরেশনগুলোকে উচ্চ পরিমাণ ঋণ নিয়ে প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। এগুলোতে উচ্চ সুদের হার আরোপ হয় এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এ ধরনের সুদযুক্ত ডিল স্ট্রাকচার করে থাকে।

৪. সেকেন্ডারি মার্কেটে সুদযুক্ত সিকিউরিটিজ ট্রেড: বিনিয়োগ ব্যাংক বন্ড, ডিবেঞ্চর, মানি মার্কেট ইন্সট্রুমেন্ট, সুদযুক্ত নোট প্রভৃতির কেনাবেচায় ভূমিকা রাখে, যা পুরোপুরি ইন্টারেস্ট-বেসড।

৫. ডেরিভেটিভস ও সুদহার-ভিত্তিক পণ্য ইনভেস্টমেন্ট: ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ, ইন্টারেস্ট ফিউচার, বন্ড ফিউচার ইত্যাদি উন্নত ডেরিভেটিভস তৈরি ও ট্রেড করে। এসব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সরাসরি সুদের হার এবং সুদ-গণিতের ওপর নির্ভরশীল।

৬. প্রকল্প মূল্যায়নে সুদভিত্তিক ডিসকাউন্ট রেট: প্রকল্পের মূল্য নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ ক্যাশ ফ্লো হিসাব, ঝুঁকি মডেল — সব জায়গায় সুদ (discount rate, cost of debt, yield) ব্যবহার করা হয়।

৭. বিনিয়োগ ব্যাংকের আয়ের উৎস: আন্ডাররাইটিং ফি, ঋণ ব্যবস্থাপনা ফি, বন্ড ইস্যু ফি — সবই সুদ-নির্ভর আর্থিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে আয় করা হয়।

ইসলামী শরীয়ায় সুদভিত্তিক সিকিউরিটি, বন্ড, ডেরিভেটিভস, সুদজনিত ঋণ কাঠামো বৈধ নয়। তাই প্রচলিত বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ের মূল কাঠামো শরীয়াহসম্মত নয়। ইসলামিক বিনিয়োগ ব্যাংকিং সম্পদভিত্তিক চুক্তি, লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি, ইজারা, মুশারাকা-মুদারাবা এবং রিয়েল অ্যাসেট-ভিত্তিক ইনভেস্টমেন্টের ওপর নির্মিত। অন্যদিকে—বিনিয়োগ ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো সুদ-নির্ভর মূলধন বাজার পরিচালনা, সুদযুক্ত বন্ড ইস্যু, সুদ-ভিত্তিক ঋণ কাঠামো, এবং সুদের ওপর ভিত্তিক ডেরিভেটিভস তৈরি—অর্থাৎ এর পুরো কার্যক্রম সুদের চারপাশে গড়ে উঠা একটি আর্থিক ব্যবস্থা।

■ বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক:

বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক (Foreign Trade Bank) হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমদানি-রপ্তানি, বিদেশি মুদ্রা লেনদেন, আন্তর্জাতিক পেমেন্ট, এলসি (Letter of Credit), রেমিট্যান্স এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থায়ন পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঝুঁকি, পেমেন্ট সিকিউরিটি এবং মুদ্রা ব্যবস্থাপনা তাদের প্রধান দায়িত্ব।

বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক ও সুদের সম্পর্ক:

১. অর্থায়নে সুদ: LC খোলা, আমদানির বিপরীতে ট্রাস্ট রিসিপ্ট (TR), প্যাকিং ক্রেডিট, পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্স— এসব ঋণ সুবিধার ওপর নির্ধারিত হারে সুদ আরোপ করা হয়। বিদেশ থেকে পণ্য কেনা-বেচার জন্য মূলধন সরবরাহ—সবই সুদ ভিত্তিক।

২. আন্তঃব্যাংক বিদেশি মুদ্রা ঋণ: ব্যাংকগুলো একে অপরকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ দেয় এবং এর ওপর সুদ ধার্য হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনে LIBOR বা SOFR-এর মতো সুদহার ব্যবহৃত হয়, ফলে সুদ পুরো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে।

৩. LC সেটেলমেন্টে সুদ হিসাব: LC বিল দেরিতে পরিশোধ করলে বা ইউসান্স (Usance LC) ব্যবস্থায় সময়নির্ভর মূল্য নির্ধারণে সুদভিত্তিক চার্জ যুক্ত হয়, যা রিবার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

৪. ফরেক্স লেনদেনে সুদভিত্তিক লাভ: বিদেশি মুদ্রার ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট, সোয়াপ, বা হেজিং পণ্যগুলোতে সুদহার ব্যবধান (interest rate differential) ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ফরেক্স ট্রেডেও সুদ একটি মৌলিক নির্ধারক।

৫. বৈদেশিক রেমিট্যান্সে সুদভিত্তিক আয়ের ব্যবহার: বিদেশি মুদ্রা আসার পর ব্যাংকগুলো সেই অর্থ বিভিন্ন সুদযুক্ত মানি মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে। ফলে আয়ের একটি অংশ সুদ থেকে আসে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিবেচনায়— বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংকের প্রচলিত এলসি, ইউসান্স বিল, ট্রেড ফাইন্যান্সিং, মুদ্রা ডেরিভেটিভস এসবই সুদ ও গারার-নির্ভর কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো। ইসলামী বিকল্প হিসেবে গবেষণা, ওয়াকাল্লা-মূলক এলসি, মুরাবাহা-ভিত্তিক আমদানি অর্থায়ন, সালাম-ইস্তিসনা ভিত্তিক বাণিজ্য অর্থায়ন প্রস্তাব করা হয়।

■ বেসরকারি ব্যাংক:

বেসরকারি ব্যাংকগুলো মূলত মুনাফাভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যাদের কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হলো আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা। এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিতরেই সুদ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

গ্রাহকের কাছ থেকে তারা যে আমানত গ্রহণ করে, তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে— এটিই তাদের *cost of fund* হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে একই অর্থ ঋণ আকারে আবার বেশি হারে সুদ নিয়ে গ্রাহকদের কাছে বিতরণ করা হয়, যাকে বলা হয় *interest spread*। এই ব্যবধানই ব্যাংকের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস।

বেসরকারি ব্যাংকগুলো— কর্পোরেট লোন, হাউজিং লোন, কার লোন, ক্রেডিট কার্ড, পার্সোনাল লোনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক অর্থায়ন করে থাকে। ফলে পুরো ব্যাংকিং চক্র লাভজনিত কারণে সুদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমানতদাতাকে সামান্য সুদ দিয়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে বেশি সুদ আদায় এই সুদ কাঠামোই বেসরকারি ব্যাংকের আর্থিক টেকসইতা বজায় রাখে। অর্থাৎ ব্যাংকের অস্তিত্ব, লাভ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক স্থিতির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় সুদ।

■ সঞ্চয়ী ব্যাংক:

সঞ্চয়ী ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত সংগ্রহ করে এবং সুরক্ষিত সঞ্চয় প্রদান করে। সঞ্চয়ী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো জনগণকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া।

সঞ্চয়ী ব্যাংক গ্রাহকের আমানতের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। এই আমানত ব্যাংক বিভিন্ন ঋণ বা বিনিয়োগে ব্যবহার করে, যেখানে উচ্চতর সুদ আদায় হয়। প্রাপ্ত সুদ এবং প্রদত্ত সুদের মধ্যে ব্যবধান ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া সঞ্চয়ী ব্যাংক হোম লোন, পার্সোনাল লোন এবং ছোট শিল্প ও ব্যবসা ঋণে সুদভিত্তিক অর্থায়ন করে থাকে।

■ **ইসলামী অর্থনীতি:** ইসলামী অর্থনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে শরিয়াহ-ভিত্তিক নীতিমালা অনুসরণ করে।

এর মূল ভিত্তি হলো সুদ নিষিদ্ধকরণ, যাকাত বাধ্যতামূলক করা, বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করা এবং ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ প্রচার করা। ইসলামী অর্থনীতি মানবকল্যাণমূলক, বৈজ্ঞানিক ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ।

এটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়বিচার এবং একটি মধ্যপন্থী পদ্ধতি অবলম্বনের উপর জোর দেয়। ইসলামী অর্থনীতি কেবল মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, বরং সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেয়। এখানে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অপরদিকে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত বিধি-বিধান বা ইসলামী শরিয়ত। এর সম্পূরক উৎস ও রয়েছে। যথা—ইজমা, কিয়াস এবং উরফ বা সামাজিক রীতিনীতি, ইজতিহাদ ও অন্যান্য নীতিকেও এর সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা ইসলামী অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো।

■ **সুদের পরিচয়:** সুদ হলো অর্থ ধার করার জন্য প্রদান করা অতিরিক্ত মূল্য বা চার্জ, যা ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে পরিশোধ করে থাকে। অর্থাৎ, এটি ঋণ ব্যবহারের প্রতিদান হিসেবে কাজ করে। সহজ ভাষায়, যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার করে, তখন সেই টাকা ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এই মূল্যকেই সুদ বলা হয়। ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, চুক্তি অনুযায়ী কোনো বিনিময় ছাড়া মূলধনের উপর যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, এই অতিরিক্ত অংশটিই হলো সুদ।

সুদকে অর্থ ধার করার খরচ বলা যেতে পারে। যা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে খরচ এবং ঋণদাতার দৃষ্টিকোণ থেকে আয় বা পুরস্কার।

সুদের প্রকারভেদ: সুদ ২ প্রকার। যথা:

- (i) সরল সুদ ও
- (ii) চক্রবৃদ্ধি সুদ।

সরল সুদ (Simple Interest) : যখন কোনো ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ প্রদান করতে হয় তাকে সরল সুদ বলে।

ধরি, ফাতিমা ১০% সরল সুদে ১০ বছরের জন্য ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। তাহলে প্রতি বছর মোট সুদ আসবে ১০,০০০ টাকা।

এখন সে এই টাকা দুইভাবে পরিশোধ করতে পারে:

ক. প্রতি বছর ১০,০০০ টাকা সুদ এবং মেয়াদান্তে আসল বা মূলধন ১,০০,০০০ টাকা ফেরত দিবে।

খ. ১০ বছর পরে একসাথে সুদাসল পরিশোধ করে দিবে। মূল বা আসল ১,০০,০০০ টাকা এবং সুদের $(১০,০০০ \times ১০) = ১,০০,০০০$ টাকা, অর্থাৎ মোট ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

সরল সুদের ক্ষেত্রে কোনো কিস্তি যদি যথাসময়ে জমা না দিতে পারে তবুও সুদের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest): সুদাসলের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করা হলে প্রাপ্ত সুদকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়।

অর্থাৎ, এখানে প্রতি নির্দিষ্ট সময় শেষে সুদ-আসলকে পরবর্তী সময়ের জন্য আসল ধরে নিয়ে সুদ হিসাব করা হয়। এক কথায় বলতে গেলে— এটি "সুদের উপর সুদ"।

আরও সহজ করে বলতে গেলে, সুদ-আসল (মূলধন + সুদ)-এর ওপর যে সুদ হিসাব করা হয়, তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে। এখানে নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্জিত সুদকে মূলধনের সাথে যোগ করা হয় এবং পরবর্তীকালে এই মোট টাকার ওপর নতুন করে সুদ হিসাব করা হয়।

ধরি, ফাতিমা এবার চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ নিলো। অর্থাৎ, ১০% সুদে ১০ বছরের জন্য ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নেয়া হলো। এমতাবস্থায়, তার সুদ আসবে যথাক্রমে:

১ম বছর=১০,০০০ টাকা,

২য় বছর=১১,০০০ টাকা

৩য় বছর =১২,১০০ টাকা

৪র্থ বছর= ১৩,৩১০ টাকা

৫ম বছর= ১৪,৬৪১ টাকা

এভাবে ১০ তম বছরে মোট সুদ আসবে= ২৩,৫৭৯.৪৮ টাকা এবং সুদাসল মিলিয়ে মোট প্রদেয় ঋণের পরিমাণ হবে= $(১,০০,০০০+১,৫৯,৩৭৪.২৫)=২,৫৯,৩৭৪.২৫$ টাকা। অথচ তা সরল সুদে ছিলো মাত্র ২,০০,০০০ টাকা। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খুব দ্রুতই বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

■ **রিবা ও সুদ কি এক? Can it be called "cost of fund" or "cost of administration"?**

অনেকেই এই ধারণা করেন যে ব্যাংকের 'সুদ' আর ইসলামে নিষিদ্ধ 'রিবা' এক নয়। এমনকি বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, "কুরআনের রিবা ও বর্তমান যুগের সুদ এক নয়। রিবা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। এখানে কোনো মানবিকতা নেই। সুদ হচ্ছে কস্ট অব ফান্ড (তহবিলের ব্যয়) বা কস্ট অব

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন(প্রশাসনিক খরচ)। ধর্ম নিয়ে যারা বেশি কথা বলেন, তাঁরা সুদ আর রিবাকে এক করে ফেলেন।"

প্রথমত, কথাটি প্রচলিত অর্থনীতির মানদণ্ডে সত্যি না। তাই, 'কস্ট অব ফান্ড'—এর ভতরে সুদকে অন্তর্ভুক্ত করা একটি বড় ধরনের ভুল। সুদ কখনো কস্ট বা খরচের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এটা মনগড়া উক্তি। খেলাপি ঋণের খসড়া নীতিমালা থেকে এটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, কস্ট ও সুদ দুটোকেই হিসাব করা হয়ে থাকে। তাই একে বৈধ বলার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, 'রিবা' আরবি শব্দ। অন্যদিকে 'সুদ' ফারসি, উর্দু ও বাংলা ভাষার শব্দ। এই তিন ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধান দেখা হলে, কোথাও পাওয়া যাবে না যে, সুদের অর্থ— কস্ট অব ফান্ড বা কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। বরং সকল ক্ষেত্রে এটাই পাওয়া যাবে যে, ঋণ গ্রহণ বাবদ ঋণের পরিমাণের হিসাবে যে অতিরিক্ত লাভ বা অর্থ দেয়া হয়, সেটাই 'সুদ'।

সবশেষে, ব্যবসায়ীর লোকসান হলেও ব্যাংক সুদ-সহ আসল ফেরত নেয়। কখনো প্রসেসিং ফি নামেও আরো কিছু নেয়। আউদ যদি হয় তাদের ভাষায় কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাহলে ব্যাংক লাভ করে কোথা থেকে? প্রকৃতপক্ষে, সুদ যদি কেবল কস্ট(খরচ) হতো, তাহলে ব্যাংক 'ফর প্রফিট' বা 'লাভ নিয়ে ব্যবসা করা প্রতিষ্ঠান' না হয়ে 'সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান' হয়ে যেতো এবং ব্যাংক কখনোই সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী, লাভজনক ও দ্রুত বর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতো না। তাই এ ধরনের কথা কখনোই বাস্তবসম্মত নয়।

আমরা জানি, 'কস্ট অব ফান্ড' বা 'কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' শব্দ ব্যবহার না করলেও জাহেলি যুগের কাফেররা "الربا مثل البيع انما" বা "ব্যবসা রিবার মতোই" অর্থাৎ 'সুদ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত' বলে থাকতো। বলা যায়, ভিন। শব্দে হলেও দেড় হাজার বছর পর একই কথা উচ্চারিত হলো!

■ **কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত রিবা:** 'রিবা' একটি আরবি শব্দ। বাংলায় সুদ বা ইংরেজীতে

Interest এর আরবি প্রতিশব্দ الرِّبَا 'আর-রিবা'। রিবা শব্দটির আভিধানিক অর্থ — অতিরিক্ত, বৃদ্ধি বা উঁচু হওয়া।

ভারত উপমহাদেশের বাদশাহ আওরঙ্গজেব রহ. অধীনে প্রায় অর্ধশতাব্দিক ফকিহগণের সমন্বয়ে রচিত 'আল-ফাতওয়াল হিন্দিয়া' গ্রন্থে রিবাব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে-

الربا هو في الشرع: عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال.

অর্থ: "শরিয়তে রিবা হলো, আর্থিক লেনদেনে বিনিময়হীন অতিরিক্ত সম্পদ।"

■ রিবাব প্রকারভেদ:

শরিয়তের পরিভাষায় রিবা মোট ২ প্রকার।

ক. রিবাল কুরআন বা রিবান্-নাসিয়াহ: কুরআনুল কারিম কর্তৃক নিষিদ্ধ রিবা। ইসলামের পরিভাষায় যাকে 'রিবান্-নাসিয়াহ' বলা হয়। এটি সেই ঋণ, যেখানে ঋণগ্রহীতার জন্য নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত পরিশোধের শর্ত থাকে।

খ. রিবাস্ সুল্লাহ বা রিবাল বুয়ু: হাদিস কর্তৃক নিষিদ্ধ রিবা। ইসলামের পরিভাষায় যাকে 'রিবাল্-বুয়ু' বা 'ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত রিবা' বলা হয়। অর্থাৎ, এক জাতীয় দুটি বস্তুর মাঝে বিনিময়ের সময় কম-বেশি করা।

এরা প্রত্যেকে আবার ২ প্রকার।

ক. রিবান্-নাসিয়াহ-র প্রকারভেদ:

(১) রিবাল-কর্জ: এর শাব্দিক অর্থ- কাটা বা কর্তন করা। যেহেতু ঋণদাতা তার সম্পদের একটি অংশ কেটে ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে থাকে তাই এই ঋণকে 'قرض' বা কর্জ বলা হয়। একে ঋণসংক্রান্ত রিবা বা Loan based Interest ও বলা হয়।

(২) রিবাদ্-দাইন: এর শাব্দিক অর্থ- ঋণ দেয়া, ঋণ নেয়া। কারো থেকে কোনো পণ্যের নির্ধারিত বকেয়া মূল্য বা নির্ধারিত ভাড়া অথবা বেতন ইত্যাদি আর্থিক সুনির্দিষ্ট দায় পরিশোধের সময় হলে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে বা মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে অতিরিক্ত প্রদান করাই 'دين' বা রিবাদ দাইন। একে দায়সংক্রান্ত রিবা বা 'দায়ভিত্তিক সুদ' বা Sale based Interest ও বলা হয়।

খ.রিবাল বুয়ু-র প্রকারভেদ:

(১) **রিবাল ফযল:** এর শাব্দিক অর্থ- কোনো কিছু অতিরিক্ত হওয়া। সমজাতীয় বস্তু যেমন- ধানের সাথে ধান, ময়দার সাথে ময়দা, তেলের সাথে তেল কিংবা মুড়ির সাথে মুড়ি ইত্যাদির লেনদেন বা বিনিময়ের সময় কম-বেশি করে লেনদেন করাটাই হলো রিবাল ফযল। অর্থাৎ সমজাতীয় ও পরিমাপীয় দুটি বস্তুর লেনদেনে বিনিময়হীন অতিরিক্ত সম্পদ।

(২) **রিবান-নাসা:** এর শাব্দিক অর্থ- বিলম্বিত করা, দেরি করা, দূরে রাখা, পিছিয়ে দেয়া। যেহেতু এই রিবা বাকিতে লেনদেন করার কারণে পাওয়া যায় তাই একে রিবান-নিসা বলা হয়। এখানে, দুটি অসমজাতীয় পরিমাপীয় বা ওজনযোগ্য অথবা সমজাতীয় ও পরিমাপীয় দুটি বস্তুর বাকিতে লেনদেন হয়। যেমন- চালের বদলে ডাল, আলু ও ডাল, সোনা-রূপার লেনদেন ইত্যাদি।

■ সুদের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ:

সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন পাকে সূরা বাকারায় সাত আয়াত, সূরা আলে-ইমরানে এক আয়াত এবং সূরা নিসায় দু'টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা রুমেও একটি আয়াত আছে। এভাবে কুরআন পাকের দশটি আয়াতে সুদের বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে।

১.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, ‘ব্যবসাও তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ-বাণী এসে গেছে, সে যদি (সুদী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা তারই। আর

তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় (সে কাজই) করল, তো এরূপ লোক জাহান্নামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

—আল বাকারা ২:২৭৫

২.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزَيِّدُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

আল্লাহ সুদকে নিশিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ।

—আল বাকারা ২:২৭৬

৩.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও।

—আল বাকারা ২:২৭৮

৪.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

তবুও যদি তোমরা (তা) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরাও (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

—আল বাকারা ২:২৭৯

৫.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَصَافًا ۖ وَتَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

—আল ইমরান ৩:১৩০

[এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়াত আমলে আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ নীতি ছিলো এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের উপর বাকি দেয়া হতো। মেয়াদ পূর্ণ হলে দেনাদার যদি দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেয়া হতো। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা পরিশোধে আপারগ হয়, তখন সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়া হতো। সাধারণ তাফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন নুকুল' গ্রন্থে মুজাহিদ রহ. এর রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লিখিত আছে। জাহিলিয়াত যুগের সেই সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।]

৬.

وَءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ

আর আমি যে বাণী নাযিল করেছি তাতে ঈমান আন, যখন তা তোমাদের কাছে যে কিতাব (তাওরাত) আছে, তার সমর্থকও বটে। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর তোমাদের অন্তরে (অন্য কারও নয়) কেবল আমারই ভয়কে স্থিত কর।

—আল বাকারাহ ২:৪১

[এতে অল্প মূল্য বলার কারণ এই যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতা'লার আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবুও তা অল্প মূল্যই হবে।]

৭.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدَبِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

মোটকথা, ইয়াহুদীদের গুরুতর সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের প্রতি এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেই, যা (পূর্বে) তাদের পক্ষে হালাল করা হয়েছিল ১১৩ এবং আল্লাহর পথে তাদের অত্যধিক বাধাদানের কারণে। এবং তাদের সুদখোরির কারণে, অথচ তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তাদের কর্তৃক মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা কাফির, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

—আন নিসা ৪:(১৬০-১৬১)

[এই দুই আয়াত থেকে জানা গেলো যে, মুসা (আ.)-এর শরীয়তেও সুদ হারাম ছিলো। ইহুদীরা যখন এর বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন দুনিয়াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। যেমনটা করা হয়েছিলো কতক পবিত্র বস্তুও তাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে।]

৮.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرَبُّوْنَ وَجَّهَ اللَّهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে (যুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।

—আর রুম ৩০: ৩৯

■ সুদের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস:

১.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ " . كَالثِّيَابِ فِيهَا الْحَيَاتُ تَرَى مِنْ خَارِجٍ بَطُونَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكْلَةُ الرَّبَا

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মিরাজের রাতে আমাকে একদল লকের কাছে নিয়ে আসা হলো। তাদের পেট ছিল ঘরের মত বিশাল, তার মধ্যে সাপ ভর্তি ছিলো, যা বাইরে থেকে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেনঃ এরা সুদখোর। [২২৭৩]

—সুনানে ইবনে মাজাহ

২.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوْلِيُّ " . يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারন ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫)

ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধবী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।

—সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৬৬

৩.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرْدَةٌ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، " فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكِلَ الرَّبَا

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দু’ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানে লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হল সুদখোর।

—সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২০৮৫

৪.

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والبيهقي

হযরত অনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এতে তিনি সুদ ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কারো সুদের একটি দিরহাম গ্রহণ করা, ছত্রিশবার ব্যভিচার অপেক্ষাও জঘন্য। সবচেয়ে জঘন্য পাপ হচ্ছে, মুসলিম ব্যক্তির সম্মতহানী করা।

(ইবনে আবুদ দুনিয়া, যাম্মিল গিবাহ্ ও বায়হাকী গ্রন্থে বর্ণিত।)

—আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, হাদীস নং ২৮৬২

৫.

قال رسول الله ﷺ:

إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا وَالزَّانِيَةُ فَقَدْ أَهْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—

যখন কোনো সমাজে ব্যভিচার ও সুদ প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের উপর আল্লাহর শাস্তি আশ্রয় করে নেয়।

—হাকেম:২:৩৭, হাদীস:২২৬১

৬.

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشأ إلا أخذوا بالربع) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন—

যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর শত্রুর ভয় ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে।

—মুসনাদে আহমদ:৪:২০৫

৭.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السابعة فنظرت فوق قال عفان: فوقى فإذا أنا برعد وبرق وصواعق قال فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا). أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده.

—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

মিরাজের রাতে যখন আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন আমি উপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিলো। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিলো। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। আমি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম: এরা কারা? তিনি বললেন: এরা সুদখোর।

—মুসনাদে আহমাদ:২:৩৫৩

৮.

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياك والذنوب التي لا تغفر) الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط ثم قرأ (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).

—রাসূলুল্লাহ ﷺ আওফ ইবনে মালেক (রা.) কে বললেন—

যেসব গুনাহ মাফ করা হয়না সেগুলো থেকে বাঁচো।

(১) গণীমতের মাল চুরি করা। গণীমতের মাল থেকে যে চুরি করবে কেয়ামতের দিন সে তা নিয়ে হাজির হবে।

(২) সুদ খাওয়া। যে সুদ খাবে সে কেয়ামতের দিন উদ্বাস্ত উন্মাদ হয়ে উত্থিত হবে। তারপর তিলাওয়াত করলেন, যারা সুদ খায় তারা (কবর থেকে) উঠবে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে, যাকে শয়তান আক্রান্ত করে বোধবুদ্ধি নষ্ট করে ফেলেছে।

—তিবরানী:১৮:৬০, হাদীস:১১০

৯.

عن يزيد بن أبي يحيى رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حملة دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك السنن الكبرى للبيهقي.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

ইয়াযিদ ইবনে আবু ইয়াহিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা. কে জিজ্ঞেস করলাম: হে আবু হামযা! আমাদের মধ্যে অনেকে তার ভাইকে কর্জ দেয়। তারপর সে (কর্জগ্রহণকারী) তাকে কোনো কিছু হাদিয়া দিতে চায় (এই হাদিয়া নেয়া উচিত হবে কি?) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কাউকে কর্জ দেয়, তারপর সে (কর্জগ্রহণকারী) তাকে (খাদ্যভর্তি) থালা হাদিয়া দেয় তখন সে যেনো তা গ্রহণ না করে কিংবা যখন তাকে নিজ বাহনে আরোহণ করাতে চায় তো সে যেনো তাতে না চড়ে। তবে যদি আগে থেকেই তাদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক থাকে সেটা ভিন্ন।

—বায়হাকী:৫:৩৫০

[অর্থাৎ, সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে; এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ কারণে তার হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত।]

১০.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة. ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন না।

এর চার ব্যক্তি হলো—

(১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি

(২) সুদখোর

(৩) অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণকারী এবং

(৪) পিতামাতার অবাধ্যতাকারী।

—(মুস্তাদরাক হাকেম:২:৩৭)

■ ইসলাম অপরিহার্য বিষয়াবলিকে হারাম বা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেনি:

সবার আগে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা কখনোই এমন কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেননি যা মানজীবনের জন্য বা মানবকল্যাণের জন্য অপরিহার্য কোনো বিষয়! No, Never! কোনো বস্তু যদি সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য অপরিহার্য হতো তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা কখনোই তা হারাম সাব্যস্ত করতেন না। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

'আল্লাহ কোনো মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না'।

—(সূরা বাকারা:২৮৬)

অর্থাৎ— আল্লাহ পাক মানুষকে এমন কোনো আদেশ করেন না, যেটি পালন করা তার জন্য সাধ্যাতীত। কাজেই একজন মুমিনের জন্য এতটুকু-ই যথেষ্ট যে, কোনো একটি বিষয়কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তারমানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা-র এই হারাম সাব্যস্তকরণই প্রমাণ করে যে, এটি কখনোই মানুষের জন্য অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়, হতে পারে না। এটি ছাড়াও মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব। এবং এর মধ্যে কোনো অকল্যাণ অবশ্যই নিহিত রয়েছে। আর যখন তিনি কোনো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেন, তখন সেটি কোনো প্রকার 'যদি-কিন্তু' ছাড়াই হারাম।

■ সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা:

সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল? এতে কি কোনো আত্মিক বা অর্থনৈতিক উপকারিতা রয়েছে? কেনই বা ইসলাম একে এত বড় গুনাহ সাব্যস্ত করেছে?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে জগতে এমন কোন সৃষ্ট বস্তু বা উপাদান নেই যে, যাতে কোনো না কোনো উপকার বিদ্যমান নেই। সাপ,বিচ্ছু,বাঘ,সিংহ এমনকি সংখ্যার মতো মারাত্মক বিষের মধ্যেও কিছু উপকারিতা রয়েছে। চুরি,ডাকাতি,ব্যভিচার,ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোনো পক্ষের জন্য উপকার নিহিত রয়েছে। কিন্তু শুধু উপকার বা সুবিধাটুকু দেখলেই হবে না। চিন্তাশীল,বিবেকবান মানুষের কাছে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপকারের বিপরীতে তার মধ্যে যে ক্ষতিটা লুকিয়ে আছে তার পরিমাণ কতটুকু? যে জিনিসের উপকার বেশি ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশি সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়।

কুরআনে পাক সুদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। তবে, মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এসবেরও তো কিছু না কিছু উপকারিতা রয়েছে, তাই না? এগুলোর মধ্যে আসলে গুনাহ ও মানুষের উপকার উভয়ই নিহিত রয়েছে। কিন্তু গুনাহের পরিমাণ ও অনিষ্ট উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। ঠিক যেমনটা-মদের ক্ষেত্রে। তাই এগুলোকে উত্তম বা উপকারী বলা যায় না।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোনো বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তাহলে তাকে উপকারী বলে সাব্যস্ত করা যায় না। যদি উপকারটা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি বা অনিষ্টতা সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, সেক্ষেত্রে একে কোনো বিবেকবান সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের মাধ্যমেও তো চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীর কিছু দুনিয়াবি উপকার হয়। তাই বলে কি আমরা একে প্রশংসাযোগ্য উপকারী জিনিস বলে মনে করি? যদি না করি তাহলে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করা হলে আমাদের এত যুক্তি-তর্ক আসে কেনো? আমরা কি এর অপকারিতা বা অনিষ্টতার পরিধি সম্পর্কে ওয়াকবিহাল না?

সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গন্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তাকে অবশ্যই অমানবিক হতে হয়, হতে হবে। তার সাময়িক উপকারটুকু শুধুই তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। অন্যদিকে এর নেতিবাচক প্রভাবে গোটা জাতিকে অপূরণীয় ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হতে হয়।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বড়ই বিচিত্র! সুদের ছটাক পরিমাণ উপকারিতার দোহাই দিয়ে আমরা এর সামগ্রিক অনিষ্টতা ও নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করি না, যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া, যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। এটি মানব স্বভাবের রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ তিক্তকে মিষ্ট মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোনো চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী-অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়। খুব কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

সুদকেই বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে। অথচ এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই যে— এতে দরিদ্র হতদরিদ্র হবে এবং পুজিঁপতি সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হয়ে আরও পুঁজি গড়বে। গরীবের রক্তচোষণ করে ক্ষীণ হতে থাকবে। তারপরেও কিছু বুদ্ধিজীবী(!) পাশ্চাত্য প্রেসক্রিপশনে বুলি আওড়াবে, সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই তারা আজ এই সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। আসল কথা হচ্ছে— সমগ্র মানবজাতির বিপর্যয়ের বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্লাবাহক সমৃদ্ধি অর্জন করে থাকে। ইনসার্ফের দৃষ্টিতে এটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়!

এরপরেও কি আমরা বুঝবো না, কেনো আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাতা'লা পবিত্র কুরআনে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন? নাতিদীর্ঘ এই আলোচনা শেষে এটি বুঝতে পারা এবং মাথা পেতে নেয়া আমাদের ঈমানের দাবি বলেই মনে করি।

■ সুদ সংশ্লিষ্টতায় পার্থিব জীবনের ক্ষতি :

১. দুনিয়াবী জীবনে নিঃস্বতা : সুদের মাধ্যমে বাহ্যত প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও তার পরিণাম নিঃস্বতা। আল্লাহ বলেন, **يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِيي الصَّدَقَاتِ** ‘আল্লাহ সুদকে সংকুচিত করেন ও সাদাকাহকে প্রবৃদ্ধি দান করেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৬)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, **إِنَّ الرَّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ** ‘সুদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’।

২. সুদী লেনদেনে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী : সুদ খেতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। তারপরেও সুদ খেলে তা হবে তাঁদের অবাধ্যতা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ** ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’ (নিসা ৪/১৪)।

৩. সুদ খাওয়া আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধের শামিল : সুদ খাওয়াকে আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُنْظَلَمُونَ** ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বাকী পাওনা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও’। ‘কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। অতঃপর যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমরা (সুদ ব্যতীত) কেবল আসলটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না’ (বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)।

৪. সুদ খাওয়া অভিশাপের কারণ : সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উপরে রাসূল (সা.) অভিশাপ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, **لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ** ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ ভক্ষণকারী, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন’।

৫. সুদ খাওয়া ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার কারণ : হাদীসে বর্ণিত ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলির অন্যতম হচ্ছে সুদ খাওয়া। রাসূল (সা.) বলেন, **اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْبَقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّخَرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ**

الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ 'সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাক্ষী মুমিনাদের অপবাদ দেয়া'।

■ সুদ সংশ্লিষ্টতায় পরকালীন জীবনের ক্ষতি :

১. সুদ আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে : সুদ খেলে আল্লাহর আযাব বা শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।

রাসূল (সা.) বলেন, إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَخْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ 'যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের জন্য আল্লাহর আযাব বৈধ (অবধারিত) করে নেয়'।

২. কবরে আযাব হবে : বারযাখী জীবনে বা কবরে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হবে, যা ক্রিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। রাসূল (সা.)-কে ফেরেশতাদ্বয় বললেন, 'আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ'ল সুদখোর'।

৩. সুদখোর ব্যক্তি ক্রিয়ামতের দিন শয়তানের আছর করা রোগীর ন্যায় দাঁড়াবে : আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'যারা সুদ খায় তারা (ক্রিয়ামতের দিন) শয়তানের স্পর্শে আবিষ্ট রোগীর মত দণ্ডায়মান হবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে উপদেশ পৌঁছে যায়, অতঃপর সে বিরত হয়, তার জন্য রয়েছে ক্ষমা, যা সে পূর্বে করেছে। আর তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় (সুদী কাজে) ফিরে আসবে, সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' (বাক্বারাহ ২/২৭৫)।

৪. সুদখোরের ইবাদত কবুল হয় না : ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য উপার্জন হালাল হওয়া জরুরী।

সুদখোরের উপার্জন যেহেতু হালাল নয়, তাই তার ইবাদতও কবুল হয় না। রাসূল (সা.) বলেন, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ‘আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু কবুল করেন না’।

৫. সুদখোরের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম : সুদখোর পরকালীন জীবনে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। রাসূল (সা.) বলেন, إِنَّهُ لَا يَرْزُقُ لَحْمٌ نَبَتٌ مِنْ سُخْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أُولَى بِهِ, ‘অবৈধ খাদ্যে যে গোশত বৃদ্ধি পায় জাহান্নামই তার জন্য উত্তম বাসস্থান’।

■ ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা:

উপক্রমণিকা :

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক অভিশাপ। সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষকে পরাধীন, যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষকে স্বাধীন, নিপীড়ক, স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী করে তুলে। আর ইসলামী অর্থনীতি এই দুই মেরুর অর্থ ব্যবস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন করে সমৃদ্ধশালী, সার্বজনীন কল্যাণকামী সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করে।

মোটকথা মানব রচিত কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা অর্থব্যবস্থা সার্বজনীন হতে পারে না। অর্থনৈতিক সফলতা ও মুক্তি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির মাঝেই নিহিত আছে।

সমাজতন্ত্র ইতোমধ্যে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিষ্কিপ্ত হয়েছে। যেমনি তার আকস্মিক আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক তার তিরোভাব। যেসব দেশ এখনও সমাজতন্ত্রের দাবীদার তারা বহুবার পরিবর্তন, সংযোজন, সংকোচন ও সংশোধনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। আর পুঁজিবাদের ইতিহাস তো শোষণ-নিপীড়ন, বঞ্চনা, অন্যায় যুদ্ধ ও সংঘাতের রক্তস্নাত ইতিহাস। পুঁজিবাদের দর্শন চরম ভোগবাদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দর্শন।

পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন হল জনহিতকর, সুষম ও সর্ব যুগোপযোগী দর্শন। যা আবহমানকাল থেকে মানব কল্যাণে অবদান রেখে আসছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থনৈতিক দর্শন, কার্যক্রম, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পুঁজিবাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায় রাখারই সুযোগ নয়, তাতে সকল প্রকার উৎপাদন-উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং যে কোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহারও করতে পারে; যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে পারে এবং যতদূর ইচ্ছা মুনাফাও লুটতে পারে। শ্রমিক নিয়োগের যেমন সুযোগ রয়েছে, তাদেরকে শোষণ করে একচ্ছত্রভাবে মুনাফা লুণ্ঠনের পথেও সেখানে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা নেই। ব্যক্তি বা গোটা সমাজ মিলিত হয়েও কাউকে কোন প্রকার কাজ হতে বিরত রাখতে পারে না- সে অধিকার কারো নেই।

এই ধরনের অর্থ ব্যবস্থা একদিকে সুদখোর, মহাজন, শোষক, কারখানা মালিক ও যালেম জমিদার-জায়গীরদারের সৃষ্টি করে। অপরদিকে মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারা বুভুক্ষুদের দল তৈরী করে। এরূপ অর্থব্যবস্থা যে সমাজে কার্যকরী হবে—সেখানে স্বভাবতই সহানুভূতি, সহৃদয়তা, মায়া-মমতা, পারস্পরিক সাহায্য প্রভৃতি মানবীয় ভাবধারা এক বিন্দুও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মনির্ভর হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হবে, কেউ কারো বন্ধু বা সাহায্যকারী হবে না। অভাবগ্রস্ত ও বুভুক্ষুদের জীবন সংকীর্ণতর হয়ে যাবে। ফলে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্যদের মুকাবিলায় চরম স্বার্থপর ও প্রতিহিংসামূলক ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই ভয়ানক চিত্র সর্বপ্রথম বৃটেনে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর তা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ‘মূলনীতি’ হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নই ছিল না। এজন্য মিল-কারখানায় যেসব পণ্য উৎপাদিত হত সেগুলো ন্যূনতম মজুরিতে সর্বাধিক উৎপাদন এবং ব্যক্তিস্বার্থের নীতিতে উৎপাদন করা হত। ফলে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা গুদামগুলো ভরে গেল।

অপরদিকে রফতানীর পথ সীমিত হওয়ায় এসব পণ্য গুদামে নষ্ট হতে লাগল। কিন্তু পণ্যের এরূপ প্রাচুর্য

হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ও গরীবরা এসব দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হলো না। পণ্য উৎপাদনের প্রাথমিক যুগে যেমন তারা নিজেদের প্রয়োজনে এসব পণ্য কিনতে পারত না, তেমনি প্রাচুর্যের সময়েও তারা এসব কেনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রইল।

সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থারূপে এই ভূতের লোভাতুর দৃষ্টি অন্যান্য রাষ্ট্রের উপরও পড়া আরম্ভ হয়। সেসব দেশকে পরাধীনতার শৃংখলাবদ্ধ করার জন্য সে ‘আরো চাই’ ‘আরো চাই’ ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলে। নিজ দেশের স্বাধীন ব্যবসায়ীদের দাসে পরিণত করার পর ‘ভূমির ক্ষুধা’ (সাম্রাজ্যবাদী লোভ) নিবারণের জন্য সে দুর্বল দেশ ও জাতিগুলোর সার্বভৌমত্ব হরণ করা শুরু করে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পালা আরম্ভ হয়। অবশেষে ভারতের মত বিরাট দেশও তাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যে সারা পৃথিবী বৃটিশ ও অন্যান্য পুঁজিবাদী শক্তির বাণিজ্যিক বাজারে রূপান্তরিত হয়।

শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জেঁকে বসে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমবিকাশমান কলাকৌশলকে বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ফসল শিল্প বিপ্লব। একই সাথে জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করা হলো— ‘খাও, দাও আর ফুটি কর’ এই ভোগবাদী দর্শন দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুবাদ হয়ে পড়লো সমাজ দর্শনের ভিত। ভোগবাদী জীবন ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের আশুনে ঘি ঢালার কাজটি সম্পন্ন করল অবাধ ও নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা। প্রথম দিকে চার্চের পুরোহিতরা কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে চাইলেও তাদের সে চেষ্টা রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। এরই সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হলো মানবতার অস্তিত্ববিনাশী ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত ভোগের চরম বাধাসৃষ্টিকারী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। পুঁজিবাদ এভাবেই তার শক্তিমত্তা ও দাপট বৃদ্ধি করে চলল। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, বিনিয়োগ পুঁজি ইত্যাদি পর্যায় পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বহুজাতিক পুঁজির বিশাল বাজারে। এ বাজার তারই রচিত, বিশ্বকে শোষণের জন্যে তারই উদ্ভাবিত কৌশল। এর অপ্রতিহত গতি ও সাফল্যকে ধরে রাখতে পুঁজিবাদের উদ্ভাবিত সর্বশেষ কৌশল হলো বিশ্বায়ন (Globalization) ও উদারীকরণ (Liberalization)।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—

১. জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন ৩. অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা ৪. উন্মুক্ত ও অবাধ অর্থনীতি ৫. ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা ৬. লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা ৭. গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন ৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী।

পুঁজিবাদের ত্রুটি :

পুঁজিবাদ যেহেতু মানব রচিত মতবাদ সেহেতু এর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলো তুলে ধরা হলো—

১. অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা ২. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব ৩. সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন। ৪. একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্ভব ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণ। ৫. বাণিজ্য চক্রের পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতি এবং ৬. চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ক্রম বিস্তৃতি।

পুঁজিবাদের বর্তমান চিত্র :

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ২. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান (ধনী-দরিদ্রের জীবন যাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০ঃ১ হতে ৭০ঃ১ এ উন্নীত) ৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ ৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন নিত্যকার দৃশ্য ৫. গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে মুষ্টিমেয় বিভ্রাটালী লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা ৬. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লেপয়জনিং ৭. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি ৮. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল এবং ৯. ইসলামের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

সমাজতন্ত্রের পরিচয়, স্বরূপ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের মজলুম শোষিত মানুষকে বুঝ দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ-নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। এজন্য কমিউনিজমের অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি (Means and Instruments of production) জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে কমিউনিস্ট সমাজে জাতীয়

অর্থোৎপাদনের উপায়-উপাদানের উপর রাষ্ট্র পরিচালক মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ প্লান-প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করে থাকে। তাদের নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের কোটি কোটি মানুষ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ-নির্যাতন শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও গরীব শ্রেণীকেও অধিকার-সচেতন করে তোলে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে অধিকার আদায়ের জন্য তারা সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গড়ে তোলে। এমনকি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তাদের প্রতি সমর্থন জানানো শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত রাশিয়ার মত বিরাট দেশে মেহনতী মানুষের বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কার্লমার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কয়েম করা হয়।

জার্মান ইহুদী কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ভাগ্যের অশেষঘণে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে একসময়ে পৌঁছে যান পুঁজিবাদের তৎকালীন সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী দেশ ইংল্যান্ডে। সেদেশে তখন রবার্ট ওয়েন, থমাস হজকিন্স, সিডনী ওয়েব, চার্লস ফুরিয়ার, সেন্ট সাইমন, লুই ব্লা, জেরেমি বেন্থামের মতো ফেব্রিয়ান সোস্যালিস্ট, হবসন ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো গিল্ড সোস্যালিস্ট ও পিগুর মতো গণদ্রব্য সরবরাহ করার প্রবক্তাদের আলোচনা ও লেখালেখির ফলে বিদগ্ধ মহলে সমাজতন্ত্র নিয়ে বেশ উত্তেজনা ছিল। এই পটভূমিতেই কার্লমার্কস দেখলেন শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শ্রমিকদের বেদনাবিধুর বিপর্যস্ত মানবের জীবন যাপন। আর এরই সমাধানের জন্যে তিনি গ্রহণ করলেন দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব, ডাক দিলেন শ্রেণী সংগ্রামের। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ— Das Kapital (১৮৬৭) এই সময়েই রচিত। তাঁর Theory of Surplus Value এই পটভূমিতেই উদ্ভাবিত। তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণী সংগ্রামের পথ ধরে পরবর্তীকালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রেণীশত্রু উৎখাত ও নির্মূলের নামে কত লক্ষ বনি আদম যে বন্দুকের নলের শিকার হয়েছিল, কত লক্ষ লোক ভিটেমাটি হতে উৎখাত হয়ে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল তার হৃদয় মিলবে না কোন দিনই। সমাজতন্ত্র যখন একটা সংগঠিত শক্তির রূপ নেওয়া শুরু করে তখন তার কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ, সর্বস্বতার একনায়কত্বের (Dictatorship of

the Proletariat) নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জনগণের মালিকানার নামে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার এবং ধর্মের আমূল উচ্ছেদ।

রাশিয়ার প্ররোচনায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়েছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায়। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে রাশিয়া সরাসরি সামরিক মদদ যুগিয়েছে, ট্যাংকের বহর পাঠিয়েছে। একই চেষ্টা চলল কিউবায়, আফ্রিকার কঙ্গো, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও ইথিওপিয়ায়। এ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল চীনেও। কিন্তু তাত্ত্বিক নীতি ও আদর্শ পরিবর্তিত হতে শুরু করল বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে। শতাব্দী প্রাচীন কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টো (১৮৪৮) ততদিনে লক্ষ লক্ষ লোককে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আরও লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে যে কত লোক লাপাত্তা হয়েছে তার কোন লেখাজোখা নেই। যাহোক বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার বাসনায় সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশগুলো তাদের পূর্বঘোষিত আদর্শের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে পুঁজিবাদের সাথে অপোষরফার নীতি গ্রহণ করে। এ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যুগোস্লাভিয়া। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সোস্যালিস্ট বা কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত সোস্যালিজম বা কম্যুনিজমের নতুন ব্যাখ্যা তাই বহু ক্ষেত্রেই ছিল মার্কসবাদের সাথে দারুণ অসংগতিপূর্ণ।

চীনও এর ব্যতিক্রম নয়। কমরেড মাওসেতুং লং মার্চের মাধ্যমে চীনে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। রেড গার্ড আন্দোলনের নামে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে বিরোধী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের মেথরের স্তরে নামিয়ে আনেন। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের হত্যা ও পাইকারী হারে বন্দী করেন। উইঘুরদের (চীনে মুসলমানদের উইঘুর ও হুই বলা হয়) নাম-নিশানা মুছে ফেলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সীমাহীন রক্তপাত, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন, প্রতারণা ও ছলনার ইতিহাস। চীন তার ব্যতিক্রম হবে কি?

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী :

১. দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ ২. ধর্মের উৎখাত ৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ ৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ৫. রাষ্ট্রীয় নিরংকুশ মালিকানা ৬. চিন্তার পরাধীনতা ৭. সর্বহারার নামে একদলীয় শাসন ৮. তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হলেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী।

সমাজতন্ত্রের ক্রটি সমূহ :

১. সম্পদের ভুল মালিকানা ও অসম বণ্টন ২. প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণে ব্যর্থ ৩. ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের সুযোগ না থাকায় প্রেষণা অকার্যকর ৪. ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ ৫. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও কাক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ এবং ৬. নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ।

সমাজতন্ত্রের বর্তমান অবস্থান :

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে।
২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ (সুদ, ব্যক্তি মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি)।
৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ।
৪. পার্টি এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক।
৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ, গোজামিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত।
৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি।
৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ।
৮. পুঁজিবাদের সাথে সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ।
৯. ইসলামের মুকাবিলায় পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় :

আল্লাহর বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। সৃষ্টজীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন, ন্যায়সংগত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থনীতি।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এস.এম. হাসানুজ্জামান বলেন, Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the *Shariah* that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to

human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society.

অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরী‘আতের বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ যেন এর ফলে মানবমন্ডলীর সমৃদ্ধি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

(১) অর্থনীতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা : ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ‘আদল ও ইহসান’ ক্বায়েম করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *وَيُنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ*, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায্যপরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেন’ (নাহল ১৬/৯০)।

(২) অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি উৎখাত করা : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা যে সাধারণ নীতি, তা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ*, ‘তারা এমন লোক, আমরা যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা সালাত ক্বায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন’ (হজ্জ ২২/৪১)।

(৩) নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা : ইসলামী অর্থনীতিতে নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা

হয়েছে। মানুষ তার সম্পদের একচেটিয়া মালিক নয়। বরং সম্পদশালীদের সম্পদে দুঃস্থ-গরীব, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ*, ‘তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে’ (যারিয়াত ৫১/১৯)।

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আর আমরা ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব যাদেরকে দেশে দুর্বল করা হয়েছে। তাদেরকে নেতা বানানো ও তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী বানানো’ (কাহাছ ২৮/৫)।

(৪) কল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ ও অকল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ করণ : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত দ্রব্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা ও সব অকল্যাণকর, অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানী-রফতানী ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
‘নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাত
তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও’ (মায়দাহ ৫/৯০-৯১)।

আল্লাহ তা‘আলা আরোও বলেন—
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
‘তোমাদের উপর হারাম করা
হলো মৃত, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গিত পশু, শ্বাসরোধে হত্যা করা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনে মৃত পশু, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা হালাল করেছ, তা ব্যতীত এবং যে পশু পূজার বেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে। আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেননা এসবই পাপের কাজ’ (মায়দাহ ৫/৩)।

উল্লিখিত খাদ্যগুলো অকল্যাণকর তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় এগুলোকে হারাম তথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, بِالْحَرَامِ غُذِّيَ الْجَنَّةُ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ ‘হারাম খাদ্যে গঠিত শরীর জান্নাতে যাবে না’।

সম্পদের সুষম বণ্টন :

ইসলাম সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ‘ধনৈশ্বৰ্য যেন কেবল তোমাদের বিভূশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়’ (হাশর ৫৯/৭)। এ আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে আইন ও পলিসির মাধ্যমে সম্পদের বিস্তার ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।

সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার :

এছাড়া সুদ-ঘুষ, শোষণ-যুলুম, মজুদদারী ইত্যাদি রহিতকরণ; যাকাত-ওশর, জিজিয়া, কর্ঘে হাসানাহ ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী শরী‘আতের পূর্ণ বাস্তবায়নই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এসব মূলনীতি কার্যকরী করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য। এসবের কার্যকরী করার ওপরই মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ নির্ভরশীল।

সুদ পুঁজিবাদের জীবনকাঠি। এটা সমাজ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার এবং মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সুদী কারবারের ফলে সমাজের বিভ্রাটের অসহায়, নিঃস্ব, দরিদ্র, বনু আদমের সম্পদ জোঁকের মত চুষে চুষে খেয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। অন্যদিকে সমাজের হতভাগ্য হতদরিদ্র মানুষগুলো দিন দিন অর্থশূন্য হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। তাই ইসলাম এ চির অভিশপ্ত সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাকাত, দান-সাদাকা ও কর্ণে হাসানা ভিত্তিক অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ

الَّذِينَ آمَنُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের পাওনা

যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধনটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না’ (বাক্বারাহ ২/২৭৮-২৭৯)।

তিনি আরো বলেন, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ‘যারা সুদ ভক্ষণ করে, তারা (কিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় সুদ খাবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে’ (বাক্বারাহ ২/২৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, الرَّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ, ‘সুদের ৭০টি গোনাহের স্তর রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে আপন মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া’। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, كَوْنُ بَشَرٍ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنْيَةً, ‘কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) সুদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও অনেক বেশী গোনাহ হবে’। ঘুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, ‘তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না’ (নিসা ৪/২৯)।

মানুষ মানুষকে ঠিকানোর জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হলো প্রতারণা-ধোঁকা। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা মানব সমাজে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিয়ে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ করেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ‘একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্যস্তুপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর আঙ্গুল ভিজা পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কি? উত্তরে সে (খাদ্যের মালিক) বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)!

বৃষ্টির পানি লেগে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, তাহলে ভিজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ফ্রেতা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন :

মানব সভ্যতা বিধ্বংসী হাতিয়ার সুদ-ঘুষ, জুয়া, লটারীকে তিরোহিত করে ইসলাম মানব কল্যাণকামী ব্যবসা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الرَّبَا وَالْبَيْعُ وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ, ‘নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম’।

■ সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প: সুদমুক্ত অর্থনীতির কাঠামো ও প্রয়োগ

এবার আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—ইসলামের আলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সুদ ও শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত ইনসাফভিত্তিক দেশ ও সমাজ গড়ার কার্যকরী সমাধান।

■ প্রথম বিকল্প: ‘মুদারাবা’

মুদারাবা এমন একটি চুক্তি যেখানে একজন ব্যক্তি (সাহিব-আল-মাল) মূলধন সরবরাহ করে এবং অন্যজন (মুদারিব) তার মেধা ও শ্রম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। অর্থাৎ, দুইটি পক্ষ থাকবে। একটি নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে কারবারটি সংগঠিত হবে, যাতে ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফায় কে কতভাগ লাভ পাবে তা সুনির্ধারিত থাকবে। লাভের কোনো নির্দিষ্ট অংক কারো জন্য নির্ধারণ করা যাবে না; বরং সম্ভাব্য মুনাফার শতকরা হার নির্ধারিত থাকবে। যেমন মূলধন দাতা ৫০%, ব্যবসায়ী ৫০% অথবা এক পক্ষ ৬০% অন্য পক্ষ ৪০%। এভাবে উভয়ের সম্মতিতে যেকোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। লাভের পরিমাণ কমবেশি যাই হোক তা উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত শতকরা হারে বন্টিত হবে। আর যদি লোকসান হয় তবে অর্থদাতার টাকা যাবে আর ব্যবসায়ীর শ্রম বৃথা যাবে।

প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সাথে মুদারাবার কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যাক :

১. সুদী ব্যবস্থায় অর্থদাতার মুনাফার অংশটি সুনির্ধারিত থাকে। যেমন-বিনিয়োগকৃত টাকার ১৫%। ব্যবসায় যে পরিমাণ লাভই হোক না কেন সে ঐ অংকের সুদ পাবেই। পক্ষান্তরে মুযারাবা কারবারে এভাবে মুনাফা ফিক্সড করার কোনো সুযোগ নেই। ব্যবসায় লাভ বেশি হলে উভয়েই তা পূর্ব নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভাগ করে নিবে। ব্যবসায়ী একা তা ভোগ করতে পারবে না। আবার লাভ কম হলে বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীর নিকট তার নির্ধারিত হারের বেশি দাবি করতে পারবে না।

২. ব্যবসা যদি লসের সম্মুখীন হয় তবে তা মুদারাবা কারবারে বিনিয়োগকারীকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ মূলধন খোয়া যাবে বিনিয়োগকারী তা ব্যবসায়ী থেকে দাবি করতে পারবে না। কিন্তু সুদী ব্যবস্থায় ব্যবসায় ক্ষতি হলেও অর্থদাতা শুধু তার মূলধনই নিবে না; বরং এর উপর নির্ধারিত সুদও আদায় করবে। ব্যবসায়ীর বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে অথবা অন্য যেকোনো পন্থায় এ টাকা সে আদায় করে নিবেই।

৩. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী যত বেশি পরিমাণ লাভই করুক অর্থদাতা শুধুমাত্র নির্ধারিত হারের সুদই পাবে। অতিরিক্ত লাভ ভোগ করবে ব্যবসায়ী একাই। কিন্তু মুদারাবা ব্যবস্থায় লাভ যত বেশি হবে অর্থদাতার মুনাফায় অংশদারিত্ব ততই বাড়বে।

বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোর টাকার মূল উৎস হচ্ছে আমানতকারী তথা একাউন্ট হোল্ডারদের জমাকৃত টাকা। বলাবাহুল্য যে, এদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র এবং কম ও বেশি জমাকারী সব ধরনের লোকই রয়েছে। তবে অধিকাংশরাই যে তুলনামূলক কম আয়ের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের কর্তৃক ব্যাংকে জমাকৃত টাকা দ্বারা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ তাদের ব্যবসা গড়ে তোলে এবং এক সময় প্রচুর মুনাফার মালিক হয় অথচ ব্যাংককে প্রদান করে সেই নির্ধারিত ১৪-১৫%। বাকি পুরোটাই ভোগ করে তারা একা। মূলত যে ১৫% সুদ প্রদান করে তাও কস্টিং চার্জের আওতায় এনে এর উপর মুনাফা হিসাব করে তা ভোক্তাদের থেকে আদায় করে নেয়। অর্থাৎ লাভের পুরোটাই থাকে তাদের কাছে। এভাবে সম্পদ হয়ে উঠে এককেন্দ্রিক, ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য বাড়তে থাকে দিন দিন। কিন্তু মুযারাবা ব্যবস্থায় যেহেতু প্রকৃত মুনাফাই কেবল বন্টনযোগ্য তাই ব্যবসার হিসাবের পূর্বে অর্থদাতার লভ্যাংশকে কস্টিং চার্জের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই এবং বেশি মুনাফা হলে কোনো পক্ষেরই এককভাবে তা কুক্ষিগত করার সুযোগ নেই।

উপরের বর্ণিত মুদারাবা পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের এমন একটি আদর্শ বিনিয়োগ ব্যবস্থা, যা শরীয়তের স্বাভাবিক, সাম্য এবং ইনসাফ ও ন্যায়ের রক্ষাকবচ। যদিও প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতি পালনে আগ্রহী নয়।

■ দ্বিতীয় বিকল্প: 'মুশারাকা'

মুশারাকা হলো একটি অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা পদ্ধতি, যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ তাদের মূলধন একত্রিত করে একটি ব্যবসা শুরু করে এবং লাভ-ক্ষতি উভয়ের মূলধনের অনুপাতে ভাগ করে নেয়। এটি একটি ইসলামি শরিয়াহ-সম্মত চুক্তি যেখানে সকল অংশীদারই মূলধন সরবরাহ করে, যা মুদারাবা (যেখানে একজন মূলধন দেয় এবং অন্যজন শ্রম দেয়) থেকে ভিন্ন।

মুশারাকা বিনিয়োগের মূলনীতি—

- যৌথ উদ্যোগ: এটি দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি, যেখানে তারা তাদের মূলধন একত্রিত করে একটি ব্যবসা শুরু করে।
- মূলধনের অনুপাত: চুক্তিতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের অনুপাত অনুযায়ী মালিকানা নির্ধারিত হয়।
- লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি: ব্যবসায় অর্জিত লাভ বা লোকসান অংশীদারদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ অনুপাতে ভাগ করা হয়।
- সদিচ্ছা ও সক্ষমতা: এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়েরই সদিচ্ছা এবং সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

মুশারাকার ব্যবহার—

- ইসলামি ব্যাংকগুলোতে এটি একটি জনপ্রিয় এবং কল্যাণমুখী বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- বর্তমান সময়ে এটিকে সরাসরি অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।
- ইসলামি ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রজেক্টে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে।
- এই পদ্ধতিটি মূলত ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই ভাগাভাগি হয়।

■ তৃতীয় বিকল্প: 'মুরাবাহা'

অনুরূপ আরও একটি পদ্ধতি হচ্ছে 'মুরাবাহা ফাইন্যান্সিং'। ধরা যাক, এক ব্যক্তি কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণের আবেদন জানালো। কিন্তু ব্যাংক তাকে টাকা না দিয়ে সেই পণ্যটি ক্রয় করে লাভের ভিত্তিতে তার কাছে বিক্রি করলো। ইসলামে এই পদ্ধতিও জায়েজ।

অর্থাৎ— মুরাবাহা হলো ইসলামিক ব্যাংকিং বা অর্থব্যবস্থায় ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি, যেখানে ক্রেতার জন্য ব্যাংক পণ্য কিনে নির্দিষ্ট লাভসহ বিক্রি করে। এটি একটি খোলা বাণিজ্য চুক্তি।

আলমুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা অর্থাৎ ব্যাংকগুলোতে প্রচলিত মুরাবাহা জায়েয হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ :

১. ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে পণ্য আসার পূর্বে তা বিক্রি করতে পারবে না। অর্থাৎ বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের নিকট পণ্য চাওয়ার পর প্রথমে ব্যাংককে তা খরিদ করতে হবে এবং হস্তগত করতে হবে। এরপর সে ক্লায়েন্ট-এর নিকট তা বিক্রি করতে পারবে।

২. কোনো না জায়েয-হারাম পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

৩. ব্যাংক যে পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে তা যদি এমন হয় যে, গ্রাহক নিজেই এর মালিক এবং সে ব্যাংকের নিকট তা নগদে কম মূল্যে বিক্রয় করে পরে আবার বাকিতে বেশি মূল্যে তা ক্রয় করে নিচ্ছে তবে কারবারটি হারাম হবে এবং সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যার নিকট বিক্রি করবে তার থেকেই এ মুহূর্তে পণ্যটি খরিদ করেছে এমন হওয়া চলবে না।

৪. বাস্তবভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় হতে হবে। এমন হওয়া চলবে না যে, কোনো দোকানে আগে থেকেই ব্যাংকের এমন চুক্তি রয়েছে যে, আমরা তোমার কাছ থেকে কোনো পণ্য খরিদ করে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করলে

সে আবার তোমার নিকট কম মূল্যে তা বিক্রি করে দিবে। অর্থাৎ বাস্তবভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় হতে হবে, হীলা-বাহানা হলে চলবে না।

৫. কারবারটি এমন হতে হবে যাতে বাস্তবেই ক্রেতার (ক্লায়েন্ট) ঐ পণ্যের জন্য অর্থায়ন দরকার। যদি এমন হয় যে, শুধু পণ্যের নাম ব্যবহার করে নগদ টাকা বিনিয়োগ নিচ্ছে পণ্য খরিদের কোনো ইচ্ছা নেই তাহলে কারবারটি হারাম হবে।

৬. ব্যাংকের নিকট বিনিয়োগপ্রার্থী (ক্লায়েন্ট) যদি এমন জিনিস খরিদের নামে টাকা নেয়, যা আগেই সে খরিদ করে ফেলেছে অথবা তা কাজেও লাগিয়ে ফেলেছে এখন সে সব পণ্যের বকেয়া মূল্য পরিশোধের জন্য অথবা টাকার অন্য কোনো প্রয়োজন হওয়ায় ঐ পণ্যের নামে ব্যাংকের সাথে মুরাবাহা করছে তবে তা-ও হবে হারাম ও সুদী কারবার।

উল্লেখ্য যে, ৫ ও ৬ নং-এর ক্রটিগুলো হয়ে থাকে এজন্য যে, ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রেই নিজে পণ্য খরিদ করতে যায় না এবং তা নিজ রিস্কেও নেয় না।

৭. মুরাবাহার একটি অপরিহার্য শর্ত হল, পণ্যটি কিছুক্ষণের জন্য হলেও ব্যাংকের দায়িত্বে ও তার রিস্কে যেতে হবে। যে সময়ের মধ্যে সেটি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা ব্যাংকের ক্ষতি বলেই ধর্তব্য হবে। যদি মুরাবাহার পণ্য ক্লায়েন্ট (গ্রাহক) কে বিক্রির পূর্বে এমন কোনো ঝুঁকি (রিস্ক) ব্যাংক বহন না করে তবে কারবার হারাম হবে।

হযরত মাওলানা তকী উসমানী এবং অন্যান্য ফকীহগণের (যারা ব্যাংকের মুরাবাহার অনুমোদন দিয়েছেন) মতে এটিই একমাত্র শর্ত যা মুরাবাহাকে সুদী কারবার থেকে ভিন্ন করে। কারণ সুদী লোনের মধ্যে ব্যাংক ক্লায়েন্টকে টাকা দেওয়ার পর তার কোনো রিস্ক সে বহন করে না। এখন যদি মুরাবাহাতেও এমনটি ঘটে এবং গ্রাহক তথা ক্লায়েন্টকে পণ্য হস্তান্তরের পূর্বে ব্যাংক তার ঝুঁকি বা রিস্ক গ্রহণ না করে তবে কারবারটি হবে সুদী লেনদেনের নামান্তর।

৮. মুরাবাহার আরেকটি শর্ত হল ক্লায়েন্টের নিকট নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করে দেওয়ার পর তা আর বৃদ্ধি করা যাবে না। অর্থাৎ সনাতনী ব্যাংকগুলো যেমন বছরান্তে বা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সুদের হার বাড়িয়ে দেয় সেভাবে মুরাবাহা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না। করলে তা সুদ হবে।

অনেকে মনে করে, এই পদ্ধতি তো হাত ঘুরিয়ে কান ধরার মতো হয়ে গেল। কারণ, এখানে ব্যাংক এক পদ্ধতির পরিবর্তে আরেক পদ্ধতিতে মুনাফা আদায় করে নিল। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন:

واحل الله البيع و حرم الربا

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।'

—(সূরা বাকারা:২৭৫)

■ চতুর্থ বিকল্প: 'ইজারা'(Leasing)

ইসলামে ইজারা (ভাড়া দেওয়া) বৈধ এবং জায়েজ। এটি একটি চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো সম্পদ (যেমন জমি, বাড়ি, যানবাহন বা অন্য কোনো সুবিধা) ব্যবহারের অনুমতি পায় এবং এর বিনিময়ে মালিককে একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা অংশ প্রদান করে। এই চুক্তিটি পারস্পরিক সম্মতি, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া উচিত।

তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে—

- চুক্তির মেয়াদ এবং ভাড়ার পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকতে হবে।
- মূল সম্পত্তি যেন নষ্ট না হয় বা নিঃশেষ হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ইজারার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপকার এবং ভাড়ার বিনিময় শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হতে হবে।

উদাহরণ— এক ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকে আবেদন জানালো। ব্যাংক তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কোন কাজে টাকা দরকার? তিনি জানালেন, কারখানার জন্য বিদেশ থেকে তার একটি মেশিন আমদানি করতে হবে। ব্যাংক তাকে টাকা দিলো না। বরং নিজের মেশিন কিনে ভাড়ার চুক্তিতে তাকে দিয়ে

দিলো। পরিভাষায় এই কাজটিকে 'ইজারা' বা Leasing বলা হয়। কিন্তু আজকাল ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোতে 'ফাইন্যান্সিং লিজিং'-এর যে পদ্ধতিটি চালু আছে তা শরীয়তসম্মত নয়। এর Agreement এ অনেকগুলো ধারা(Clauses) শরীয়ত পরিপন্থী। তবে একে খুব সহজেই শরীয়তসম্মত বানিয়ে নেয়া যায়। পাকিস্তানে এরূপ একাধিক ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলোর Leasing Agreement শরীয়ত সম্মত।

■ কর্জে হাসানা কিভাবে সুদের বিকল্প হতে পারে?

আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হলো 'কর্জে হাসানা'। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে মানুষকে কর্জে হাসানা প্রদানের পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন—

"দানশীল পুরুষরা আর দানশীল নারীরা আর যারা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর তাদের জন্য আছে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান।"

—সূরা হাদিদ, আয়াত:১৮

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন—

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে কর্জে হাসানা

দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন আর তার জন্য আছে সম্মানজনক প্রতিফল।

সেদিন তুমি মুমিন ও মুমিনাদের দেখবে, তাদের সামনে আর তাদের ডানে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে।

(তাদেরকে বলা হবে) 'আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে

(তোমরা) চিরকাল থাকবে।' এটাই হলো বিরাট সফলতা।"

—সূরা হাদিদ, আয়াত: ১১-১২

কর্জ শব্দের অর্থ 'ঋণ' আর হাসানা শব্দের অর্থ 'উত্তম'। অর্থাৎ, কর্জে হাসানার অর্থ দাঁড়ায় 'উত্তম ঋণ'।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অতিরিক্ত কোনোকিছু লাভের শর্ত ছাড়া কাউকে ঋণ দিলে তাকে 'কর্জে হাসানা' বা 'উত্তম ঋণ' বলে।

কর্জে হাসানার বিধান—

•এই লেনদেনে ঋণগ্রহীতা যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ নিয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ সময়মত পরিশোধ করে দিতে হবে।

•অন্যদিকে, কোনো বস্তু বা ফসল দিয়ে কর্জ দেয়া হলে, সমপরিমাণ ও সম-মানের বস্তু বা ফসল ফেরত দিতে হবে।

•কর্জ গ্রহীতার উপর আলাদা করে ঋণের অতিরিক্ত কোনো কিছু প্রদান করার কোনো প্রকার শর্ত দেয়া যাবে না। যেমন:

ক. বস্তু বা ফসল দিয়ে কর্জ দিলে সমপরিমাণ কিন্তু উন্নত মানের বস্তু বা ফসল ফেরত দেয়ার শর্ত দেয়া যাবে না। সমপরিমাণ এবং সমমানের বস্তু বা ফসলই হতে হবে।

খ. কর্জের বিপরীতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো প্রকার উপকার নেয়া যাবে না।

•যে ব্যক্তি কর্জে হাসানা নিলো, সে সকল ঝুঁকি বহন করবে। দাতা কোনো ঝুঁকি বহন করবে না।

ক. ঋণ দেয়া অর্থ ও সম্পদ হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলেও পুরো অর্থ বা সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

খ. কর্জ-দাতা কর্জ দেয়া অর্থ বা সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা/লভ্যাংশের কোনো ভাগ পাবেন না। তেমনি ক্ষতির কোনো অংশও বহন করবেন না।

•তবে, কর্জ গ্রহীতা নিজের পক্ষ থেকে মূল কর্জের অতিরিক্ত পরিমাণ ফেরত দিতে চাইলে তার অনুমতি রয়েছে। এটি শর্তসাপেক্ষে সম্পূর্ণ জায়েজ এবং উত্তম। এক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে কোনো পূর্বশর্ত থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে আগেই কোনো সমঝোতা না থাকা।

•কর্জে হাসানার গ্রহীতা কর্জ ফেরতে অপারগ হলে কর্জ-দাতা সেই কর্জ মার্ফ করে দিতে পারবেন।

এক্ষেত্রে তিনি চাইলে যাকাত হিসেবেও দিতে পারবেন। তবে সেটাও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। এই টাকা তোমাকে যাকাত হিসেবে দিলাম এভাবে কাটিয়ে গেলে যাকাত আদায় হবে না। বরং পুনরায় সমপরিমাণ টাকা তাকে যাকাত হিসেবে দিবে। ঋণগ্রহীতা যাকাতের অর্থ বুঝে পাওয়ার পর দাতা তা পুনরায় নিয়ে যাবেন ঋণ পরিশোধ হিসেবে। এভাবেই কেবল যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় যাকাত অনাদায়ী রয়ে যাবে।

কর্জে হাসানা দিতে গিয়ে কেউ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান জমা আছে। কর্জে হাসানা একটা চিন্তা বা নীতি যা বারবার

অনুশীলন করার মতো ব্যাপার। যারা এই চিন্তার বাইরে তাদের জন্য এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝা কঠিন। আর কর্জে হাসানা যে কেবল মুসলিমদের জন্য উপকারী ব্যাপারটি এমন নয়। একটি সেকুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থাও কর্জে হাসানার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। করোনা মহামারির সময় যখন সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় সেই অবস্থায় (ঋণ+সুদ) কিস্তিতে ফেরত চাইলে অর্থনীতির উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা সকলেই অনুমেয়। এজন্যই সেবছর পশ্চিমা বিশ্বের সরকাররা আইন করে ঋণের উপর সুদ বন্ধ করে দেয় মহামারি চলাকালীন সময়ের জন্য। লক্ষণীয় যে, বিপদের সময়ে তারা সুদ স্থগিত রেখে কর্জে হাসানার কাছাকাছি একটা সমাধানকেই তাদের জন্য উপকারী হিসেবে বিবেচনা করেছে। সুতরাং এটা বুঝা যায় যে, কর্জে হাসানার পুরোপুরি বাস্তবায়ন দীর্ঘ মেয়াদে মানবসমাজের জন্য আরো অনেক উপকারী হতো।

পরিসংখ্যান মতে, ২০২০ সালে উন্নত বিশ্বে দেউলিয়া হওয়ার হার ছিলো বর্তমান সময়ের সর্বনিম্ন। যেখানে অন্য সকল দিক থেকেই বছরটি ছিলো সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। সেখানে শুধু আমেরিকাতেই দেউলিয়ার আবেদন কমেছে ৩০%! সবসময় কর্জে হাসানা উপস্থিত থাকলে আমরা কতটা উপকার পেতে পারতাম!

■ যাকাত: সুদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইসলামের ন্যায্য অর্থনৈতিক সমাধান

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক এবং মিশ্রঅর্থনীতি দেশের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল- দারিদ্র্য বিমোচনপূর্বক সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু এর বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত আর তত্ত্বটি গলদপূর্ণ। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি শাস্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গবাদী পশু, স্বর্ণ ও রৌপ্য, ব্যবসায়ী পণ্য, উৎপন্ন ফসল, নগদ অর্থ ও মওজুদ সম্পদ এর ইসলামী বিধি অনুযায়ী নিসাব এর ভিত্তিতে যাকাত আদায় করা ফরয। অর্জিত এ যাকাতের অর্থ আল্লাহ ৮টি খাতে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাত প্রদানের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, আয় বৈষম্য হ্রাস, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সহায়তা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বণ্টন

ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করে। সেই সাথে ঋণমুক্তি, মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, সামাজিক নিরাপত্তা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাস্তবায়ন, সৌহার্দ্য ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি এবং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

অপরদিকে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করে না বিধায় সমাজে হ'ত দরিদ্র, নিম্ন- মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দেয়। একশ্রেণীর লোকের হাতে দেশের সম্পদ কুক্ষিগত হয়। তাদের নির্দেশিত অর্থব্যবস্থা সর্বদা দারিদ্রের দুষ্টিচক্রে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত আদায় এবং গ্রহণের ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। যাকাত প্রদানকারীর সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়, আর যাকাত গ্রহণকারীরা তাদের ন্যায্য প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমতা বিরাজ করে। একমাত্র সর্বোত্তম তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থাই সক্ষম মানব সমাজে প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে মিলেমিশে বসবাস করে একটি সুন্দর পৃথিবী আবাদযোগ্য করতে।

যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। যাকাত শব্দটি গুরুত্বের দিক থেকে কুরআনে প্রত্যক্ষভাবে ৩২ বার উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে সালাত ও যাকাতের কথা একত্রে এসেছে ২৮ বার। ফুয়াদ আব্দুল বাকী বর্ণনা করেছেন, কুরআনে মোট ১৯টি সূরায় ২৯টি আয়াতে যাকাত শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। যাকাত ছাড়া ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা কখনো সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনে যাকাত যেমন প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তার বিকল্প নেই। আব্বাহর বাণী, 'তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও' (বাক্বারাহ ২/৪৩, ৮৩, ১১০, ২৭৭; নিসা ৪/৭৭, ১৬২; নূর ২৪/৫৬; আহযাব ৩৩/৩৩; মুয্যাম্মিল ২০)।

আধুনিক যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হল কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তব জগতে হয় ঠিক তার উল্টো। কেননা, রাষ্ট্রীয় কল্যাণে অর্থনীতিবিদগণ যেসব অর্থনীতির নিয়মাবলী বা বিধিমালা প্রদান করেছেন তা স্থির নয়, বরং কতগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ অস্থির অর্থনীতির নিয়ম-কানুন দেশে সার্বিকভাবে স্থিতিশীল কোন সমাধান দিতে পারে না। আর ইসলামী বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক। এর নিয়ম অনুযায়ী ইসলামী অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হলে রাষ্ট্রে কোন প্রকার আর্থিক সমস্যা থাকবে না। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা জন্ম দেয়- সম্পদের বৈষম্য, শ্রমিক শোষণ, সামাজিক অকল্যাণ, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, অপরিকল্পিত উৎপাদন, বেকার সমস্যা ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এসবের ভিত্তি নেই, যা রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে।

বর্তমানকালে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানরূপে কেবল তার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে, নৈতিক দিক আলোচনা করে না। ফলে অর্থনীতিতে ভোগের প্রাধান্য পায় ঠিকই- তবে নিরন্ন ও অসহায় মানুষের কথা আলোচনায় আসে না। সম্পদ কুক্ষিগত করার যাবতীয় কৌশলের কথা বিশ্লেষিত হয় কিন্তু সদাচরণ, নৈতিক মূল্যবোধ, বিভূহীনদের কথা আলোচনা হয় না। সম্পদই যেন মূল্য, মানুষ নয়। কিন্তু ইসলাম সমষ্টিগত কল্যাণ চায়, কোন গোষ্ঠীর নয়।

আধুনিক অর্থনীতির দর্শনে মূল্যবোধ বিবেচিত হয় না এবং ইহজগত ও পরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক কল্যাণের মূল লক্ষ্যও বিবেচিত হয় না। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় লোকেরা অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য ছাড়াও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ করতে পারে। একমাত্র যাকাত দ্বারা উৎপাদন, ভোগ এবং বণ্টন ব্যবস্থায় সর্বাধিক সামষ্টিক কল্যাণ সাধন করা যায়।

প্রচলিত অর্থনীতির ধারণা মতে, বিনিময় মূল্য আছে এমন বস্তুর উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলা হয়। এ অর্থে মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হিরোইন প্রভৃতি দ্রব্যগুলোর অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে। পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক (Capitalistic), সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক (Socialistic or Command) এবং মিশ্র (Mixed) অর্থব্যবস্থায় এ সমস্ত দ্রব্যগুলোকে ‘অর্থনৈতিক দ্রব্য’ বা সম্পদ বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য। স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি বিশেষ মূলনীতি বেঁধে দিয়েছেন। যে পথে চললে কখনো বিপদগামী হবে না। সম্পদ এবং তার ব্যবহার, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, বাজার ব্যবস্থা পরিচালনা, উৎপাদন এবং তার মূল্য নির্ধারণ, দরিদ্রদের প্রতি ধনীদে অর্থনৈতিক দায়, হালাল ও হারামের বিধান, সামাজিক নিরাপত্তা, সুদমুক্ত অর্থনীতি, উত্তরাধিকার আইন, অপচয় হ্রাস, অপব্যয় এবং বিলাসিতার নিন্দা, সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা, যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন, মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতি স্পষ্ট মতামত দিয়েছে। ইসলাম ন্যায়শাস্ত্রের সাথে অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করে একটি কল্যাণকর শাস্ত্র হিসাবে অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে এমন কতিপয় উপায় রয়েছে, যা আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটাতে সহায়তা করে। যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হয়। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে দান করা পুণ্যের

কাজ। অথচ সেখানে দানের কোন মানদণ্ড বা পরিসীমা বিবেচনা করা হয়নি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা গাণিতিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সঞ্চিত সম্পদের উপরে যাকাত নির্ধারণ করেছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হল—

উৎপাদন ক্ষেত্রে যাকাতের প্রভাব :

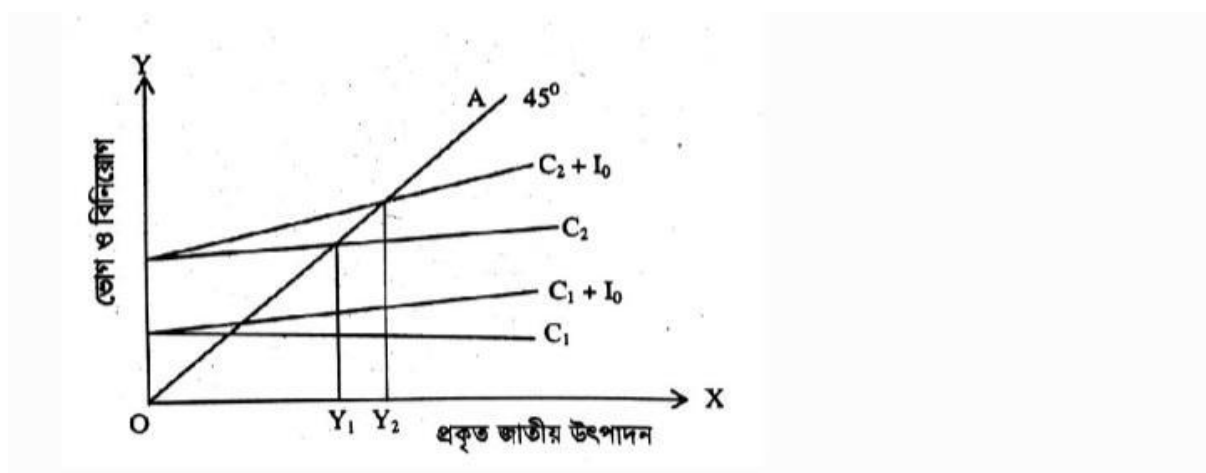
আল্লাহ্ বলেন, ‘যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে। প্রত্যেকটি শীষে একশ’টি দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বর্ধিত করে দেন। আর আল্লাহ প্রশস্ত দানশীল ও সর্বত্ত্ব’ (বাক্বারাহ ২/২৬১)। অন্যত্র বর্ণিত আছে, ‘আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করেন ও সাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৬)।

ধর্মীয় জীবন দর্শনেই মানুষের সামগ্রিকভাবে সফলতা আসে। আগামী ৫০ বছরের উন্নতি সমৃদ্ধি কোন ধরনের গবেষণার ওপর নির্ভরশীল এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ড. চার্লস স্টেইনমেজ (Dr. Charles Stinmetz) বলেন, “I think that the greatest discoveries will be made along spiritual times. Some day People will learn that material things do not bring happiness and are of little use in making men and women creative and powerful. Then the Scientist of the world will turn their laboratories over to the study of god and the spiritual forces which as yet have been hardly scratched. When that they comes, the world will see more advancement in one generation in has the last four.” ‘আমি মনে করি, সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হবে আধ্যাত্মিকতার পথ ধরে। একদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে, বস্তুগত জিনিস মানুষের সুখ-শান্তি আনে না এবং এগুলো নর-নারীকে সৃজনশীল ও ক্ষমতাশালী করতে খুব কমই কাজে আসে। তখন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাগারগুলোকে আল্লাহ্, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে ঘুরিয়ে নেবে, যার সম্পর্কে বর্তমানে খুব কমই আলোচিত হয়। তখন বিশ্ব এক প্রজন্মে অনেক সমৃদ্ধি দেখবে, যা বিগত চার প্রজন্ম দেখেনি’।

সামষ্টিক অর্থনীতির জনক এবং বিশিষ্ট পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইন্স বলেন, ‘পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধনীরা কম ভোগ করে। অপরদিকে, গরীব শ্রেণীর কাছে ভোগ করার মতো অর্থ না থাকায় তারা ভোগ করতে পারে না। ফলে সামগ্রিক চাহিদা কম হয়। এর ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ কম হয়, নিয়োগ কম হয়

এবং জাতীয় আয়ও কম হয়'। যাকাত অর্থনীতির এরূপ বন্ধাবস্থাকে উদ্ধার করতে সক্ষম। যাকাত প্রাপ্তির ফলে গরীব শ্রেণীর লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার পরিমাণও বাড়ে। আর বিনিয়োগকারীরা অধিক মুনাফার আশায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. ওমর চাপড়ার মতে, 'যাকাত অলস সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, যা ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির প্রভাব সৃষ্টি করে'। বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম.এ. মান্নান মনে করেন, যাকাত সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ভোগে স্থানান্তর করে এবং সামগ্রিক চাহিদা বাড়ায়। যাকাতের ফলে অলস অর্থ উৎপাদনের কাজে আসে। তাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হয়। যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের জন্য বিলাসজাত সামগ্রী উৎপাদনের তুলনায় গরীবের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে সম্পদ বেশী নিয়োজিত হয়। তাছাড়া ধনী লোকেরা ভোগের জন্য আয়ের এক অংশ ব্যয় করে আর গরীবেরা ভোগের জন্য আয়ের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করে থাকে। আল্লাহ বলেছেন, 'লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে সুদ প্রদান করে থাক, আল্লাহর নিকটে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে (জান্নাতে) আল্লাহর চেহারা অন্বেষণে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তারা বহুগুণ লাভ করে থাকে' (রূম ৩০/৩৯)। সুতরাং যাকাত উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল—



উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রকৃত জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে। OA হচ্ছে 45° রেখা। যাকাত প্রাপ্তির পূর্বে ভোগ রেখা C1 এবং সামগ্রিক চাহিদা (AD) রেখা $C1+I0$ । যাকাত প্রাপ্তির ফলে গরীব শ্রেণীর ভোগ রেখা পরিবর্তিত হয়ে C2 এবং সামগ্রিক চাহিদা (AD) রেখা $C2+I0$ হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যাকাত প্রাপ্তির ফলে ভোগ ও বিনিয়োগ যেমন বেড়েছে, একই সাথে প্রকৃত জাতীয় আয় $OY1$ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $OY2$ হয়েছে। অর্থাৎ $Y1$ থেকে $Y2$ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন্টনের ক্ষেত্রে যাকাতের প্রভাব :

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। সকল ইসলামী অর্থনীতিবিদ একথা স্বীকার করেছেন যে, যাকাত যদি যথাযথভাবে আদায় ও বন্টন হয় তবে তা বর্তমানে বিদ্যমান আয় ও ধনবন্টন বৈষম্য দূরীকরণে সক্ষম হবে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল-তাহির দশ বছর মেয়াদের তথ্য ব্যবহার করে ধনী ও গরীবের মধ্যে আয়ের পার্থক্যে যাকাতের প্রভাব নির্ধারণের জন্য একটি সরল তুলনামূলক স্থির অবস্থা নির্মাণ করেন। তাঁর গৃহীত অনুমিতির ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আয়ের পার্থক্য ৯ হতে ৬.৫ গুণ হ্রাস পায়। অন্য একজন গবেষক ড. আনাস জারকা দেখিয়েছেন যে, যাকাত প্রতি বছর সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ১০% জনগণের আয়কে দ্বিগুণ করে দেয়। কারণ এ অর্থের প্রায় পুরোটাই ধনীদের কাছ থেকে এসেছে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

যাকাত কিভাবে সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাস করে তা একটি কাল্পনিক তালিকায় দেখানো হল :

নাম_সম্পদ_যাকাতের হার_পরিমাণ_অবশিষ্ট সম্পদ

ক- ৫,০০,০০০ -২.৫%-১২,৫০০-৪,৮৭,৫০০

খ- ১৫,০০,০০০ -২.৫%-৩৭,৫০০-১৪,৬২,৫০০

গ- ২৫,০০,০০০ -২.৫%-৬২,৫০০-২৪,৩৭,৫০০

ঘ- ৩৫,০০,০০০ -২.৫%-৮৭,৫০০-৩৪,১২,৫০০

ঙ- ৪৫,০০,০০০ -২.৫%-১,১২,৫০০-৪৩,৮৭,৫০০

চ- ৫৫,০০,০০০ -২.৫%-১,৩৭,৫০০-৫৩,৬২,৫০০

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ৬ জন ব্যক্তির কাছ থেকে মোট আদায়কৃত যাকাতের পরিমাণ

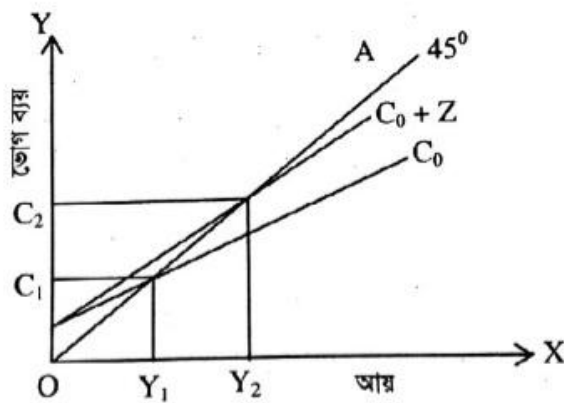
৪,৫০,০০০ টাকা। এ দেশে ১০০ জনেরও কম ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত যাকাত

প্রদান করেন। আমাদের হিসাবে বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত যাকাত দেয়ার যোগ্য মানুষের সংখ্যা হবেন কমপক্ষে ৫০,০০০ জন।[10] এভাবে ধনী লোকদের থেকে আদায়কৃত যাকাত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হ'লে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমাজে আয় বৈষম্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এভাবে ক্রমাগত আয় বৈষম্য হ্রাস পেতে পেতে তা ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসবে। সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ হবে।

ভোগের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা :

ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত কতিপয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। যাকাত গরীবের মাঝে ভোগের জন্য ব্যয় করা হলে গরীবের ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোগ প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতির বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ধনীদের তুলনায় গরীবদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) বেশ উঁচু। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম দেশে গরীবদের সংখ্যাই বেশী। যাকাত যেহেতু ধনীদের থেকে দরিদ্রদের কাছে হস্তান্তরিত আয়, সেহেতু এ বিষয়ের তাৎপর্য হ'ল- অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়ের ফলে সামাজিক ভোগব্যয় বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব দেশে ভোগ প্রবণতা নিঃসন্দেহে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে।

যাকাত কিভাবে ভোগব্যয় বৃদ্ধি করে নিম্নে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হ'ল :



উপরের চিত্রে OX অক্ষে আয় এবং OY অক্ষে ভোগ দেখানো হয়েছে। OA হচ্ছে 45° রেখা। যাকাত প্রাপ্তির পূর্বে ভোগ রেখা CO এবং ভোগের পরিমাণ OC1। যাকাত প্রাপ্তির পর ভোগ রেখা CO+Z এবং ভোগের পরিমাণ OC2 হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভোগের পরিমাণ C1 থেকে C2 বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালন করে থাকে। যাকাত প্রাপ্তির ফলে গরীবের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে ভোগব্যয় বাড়ে। ভোগব্যয়ের অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় হয়। এ সঞ্চয় মূলধন গঠন করে, মূলধন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে। বিনিয়োগ উৎপাদন সৃষ্টি করে, উৎপাদন আয় সৃষ্টি করে, এ আয় থেকে পুনরায় দরিদ্রদের যাকাত প্রাপ্তি হয়। এভাবে চক্রাকারে যাকাত প্রাপ্তির ফলে ক্রমান্বয়ে আয় বৈষম্য দূরীভূত হবে এবং ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে আসবে।

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ আব্দালাতি বলেন, “Zakat mitigates to a minimum the suffering of the ready and poor members of Society. It is a most comforting consolation to the less fortunate people. Yet it is a loud appeal to

everybody to roll up his sleeves and improve his lot. অর্থাৎ যাকাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করে। এটি অভাবীদের জন্য শান্তি ও ভাগ্যোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায়। দুস্থ অভাবগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধানে যাকাতই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যাকাত উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলে, গরীব জনগণের ভোগের চাকা যেমন ঘুরবে তেমনি সরকারের রাজস্ব ফান্ড সমৃদ্ধ হবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি হবে আরো বিস্তৃত। তবেই ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি দিতে পারে একটি সুন্দর, সুস্থ, সুষ্ঠু ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণধর্মী শান্তি-শৃঙ্খলার সর্বোত্তম আর্থিক ব্যবস্থা।

■ সুকুক এবং শরীয়াহ: বর্তমান সমস্যা ও করণীয়

প্রচলিত অর্থে সুকুক হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে সুদভিত্তিক বন্ডের বিকল্প। বন্ডের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনগণ থেকে ঋণ নেয়। সেই ঋণ গ্রহণ করতে গিয়ে যে ডকুমেন্ট সরকার দেয় সেটাকে বিভিন্ন

ইউনিট বা এককে ভাগ করা হয়। যেমন দশ হাজার টাকার ইউনিট। এক হাজার টাকার ইউনিট। একেকটা ইউনিট একেকটা বস্তু।

বাংলাদেশে সরকার সম্প্রতি একটি সুকুক ইস্যু করেছে, যা ইসলামী নামে প্রচারিত হলেও বাস্তবে শরীয়াহর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়নি। ইস্যুর সময় তাড়াহুড়ো ও অপর্യാপ্ত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে চুক্তিতে নানা ঘাটতি, অসংগতি এবং শরীয়াহ লঙ্ঘন দেখা দিয়েছে। মূল সমস্যা হলো সম্পদের পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ, ট্রাস্টি ও ইস্যুকারীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব, পুনর্বিক্রয়যোগ্যতার অস্পষ্টতা, এবং প্রাথমিক প্রসপেক্টাসে থাকা ভুল-ত্রুটি। এসব বিষয় সাধারণ ধর্মপ্রাণ বিনিয়োগকারীর জন্য প্রতারণার ঝুঁকি তৈরি করেছে।

শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি বোর্ড থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান অনুপস্থিত। বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ ফিকছল মুআমালা জ্ঞানও নেই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা দেখায়, শরীয়াহ বোর্ড থাকা সত্ত্বেও প্রোডাক্টের বাস্তব প্রয়োগে শরীয়াহ মানা হয় না। ইস্যুকারী ও ট্রাস্টি একই গোষ্ঠীর লোক হওয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়।

এ অবস্থায় করণীয় স্পষ্ট: সুকুক-চুক্তি সংশোধন, প্রাথমিক ভুল-ত্রুটি মিটিয়ে নতুন প্রসপেক্টাস ইস্যু, এবং বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ শরীয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। এতে বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং ইসলামী বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। নইলে ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতারণার শিকার হবেন এবং ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি অমান্য হবে।

■ শরীয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা:

শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা হলো এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যা ইসলামী শরীয়াহর নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়, যেখানে সুদ (রিবা) গ্রহণ ও প্রদান নিষিদ্ধ এবং লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগির ভিত্তিতে লেনদেন হয়। এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার উপর জোর দেয় এবং সুদমুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য রাখে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর একাউন্টধারী ডিপোজিটারগণ শুধু নিরাপত্তার বিবেচনায় তাদের কাছে টাকা রাখেন না; বরং তারা কষ্টার্জিত অর্থ এ ব্যাংকগুলোতে বিনিয়োগ করে কিছু হালাল মুনাফার আশায়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকগুলো তথা এর মালিকপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হল মানুষকে দেওয়া মুনাফা হালাল হওয়ার বিষয়টি শরীয়াহের কষ্টিপাথরে নিশ্চিত করা।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর উচিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রপার ইসলামাইজেশনের পাশাপাশি শরীয়া পরিপালনের সূচক উর্ধ্বগামী করার লক্ষ্যে আরও যা যা পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার সবকিছুর বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং সুদ ও নাজায়েয-হারাম কারবারের লানত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

তারই ভিত্তিতে মুফতী তাকী উসমানির পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ নিম্নরূপ—

১. মালিক পক্ষের সদৃষ্টি: ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়া পরিপালন তথা ইসলামাইজেশন নিশ্চিত করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন মালিক পক্ষ তথা বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সদৃষ্টি ও আন্তরিকতা। শরীয়া বিষয়ে যদি তারা আপোষহীনভাবে ঐকান্তিক ও আন্তরিক না হন, যদি ইসলামী হওয়া সত্ত্বেও তারা সুদের সাথে একই গতিতে, একই পথে এবং একই পন্থায় (শুধু নাম ভিন্ন করে) দৌড়াতে থাকেন তবে ইসলামাইজেশন কখনো সফল হবে না।

২. কর্মীদের প্রশিক্ষণ: প্রথম শর্ত পূরণের পর দ্বিতীয় কাজটি হল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে গ্রুপ গ্রুপ করে দীর্ঘ মেয়াদী প্রয়োজনীয় (শরীয়া পরিপালন বিষয়ক) প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমরা জানি যে, এসব ব্যাংকে কর্মরত অনেক ভাই শরীয়তের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। কিন্তু পুরো জীবন পুঁজিবাদী পদ্ধতির উপর পড়াশোনা করে আসা অথবা সে লাইনে কাজ করে আসা কাউকে ২/৪দিন বা সপ্তাহ খানেক কয়েক ঘন্টার কর্মশালার মাধ্যমে তো আর ইসলামী ব্যাংকিং শিখিয়ে ফেলা যায় না।

৩. শরীয়াহ কাউন্সিল: মালিক পক্ষের সদৃষ্টির পর ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন একটি শরীয়াহ কাউন্সিল যাদের হাতে থাকবে প্রচুর ক্ষমতা যারা এডভাইজারী কাউন্সিল না হয়ে সুপারভাইজারী কাউন্সিল হবে। তবে ঐ বোর্ডের সদস্য হতে হবে এমন যোগ্য আলেমে দ্বীনকে যিনি কুরআন-হাদীসকে মূল থেকে (অনুবাদ থেকে নয়) বোঝার ও বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা রাখেন। যিনি ফিকহ বিষয়ক মৌলিক লেখাপড়া

করেছেন, যিনি ফিকহুল মুআমালাত সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান রাখেন এবং যিনি একনিষ্ঠ, কর্মঠ ও সৎসাহসী। ব্যাংকওয়ালাদেরকে চেষ্টা-তদবীর করেও শরীয়া পালন করাতে ব্যর্থ হলে যিনি ঘোষণাদান পূর্বক ইস্তফা প্রদান করতে দ্বিধা করবেন না। যিনি অযথা নাজায়েয ও মাকরুহ কাজগুলোকে হীলা-বাহানার আশ্রয় নিয়ে জায়েয করার চেষ্টা করবেন না অথবা নিজে কাউন্সিলে আছেন শুধু এ কারণে কাউকে ইসলামী হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের কিন্তু একাধিক ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিল থেকে ঘোষণা পূর্বক ইস্তফা প্রদান করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

৪. শাখায়-শাখায় শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ: মজবুত ও যোগ্য শরীয়াহ কাউন্সিলের সাথে সাথে প্রতিটি শাখায় এক বা একাধিক যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলেম শরীয়াহ কাউন্সিল প্রতিনিধিকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যার স্বাক্ষর ছাড়া কোনো বিনিয়োগ অনুমোদিত হবে না। যিনি শরীয়া পরিপালনে ঐ শাখার লোকজনকে সাহায্য করবেন এবং ব্যাংকের ক্লায়েন্ট ও অন্যান্যদের শরীয়াহ বিষয়ক পরামর্শ ও অভিযোগ শুনবেন আর তাদের প্রশ্নের জবাব দিবেন।

৫. শরীয়াহ বিষয়ক অভিযোগ সেল: উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি রাজধানী ও বিভিন্ন জেলা শহরে শরীয়াহ বিষয়ক অভিযোগ সেলও থাকতে হবে। যেখানে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ এতৎসংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আশা করা যায় যে, উপরোক্ত সুপারিশগুলো এবং এ জাতীয় অন্যান্য শর্তাবলি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলেই কেবল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইসলামী হওয়ার বিষয়টি যথার্থ হবে। আল্লাহ তাআলাই নেক কাজের তাওফীক দাতা।

■ আধুনিক ও সমসাময়িক কিছু মাসালা/ফতোয়া:

■ ব্যাংকে চাকুরী করা হারাম কেনো?

ব্যাংকের চাকুরি হারাম হওয়ার মূল কারণ দু'টি। যথা-

১-হারাম কাজে সহায়তা করা।

২-হারাম মাল থেকে বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

হারাম কাজের সহায়তার বিভিন্ন স্তর আছে। শরীয়তে সব প্রকার সহায়তা হারাম নয়। বরং সে সব সহায়তাই হারাম যা সরাসরি হারাম কাজের সহিত জড়িত থাকে। যেমন, সুদী লেনদেন করা। সুদী লেনদেন লিখে রাখা। সুদী টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে উসুল করা ইত্যাদি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-

“যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে তার সাক্ষী হয়, এবং যে দলিল লিখে রাখে, তাদের সকলের উপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৩৮০৯, মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদিস নং-৪৯৮১)

শরীয়তের বিধান মতে সুদ দেওয়া, গ্রহন করা, তাতে সহযোগিতা করা সবই হারাম।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

[২:২৭৮] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। [সূরা বাকারা-২৭৮]

[৩:১৩০] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। [সূরা আলে ইমরান-১৩০]

হাদিস শরিফে এসেছে-

أَلْعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

আল্লাহর রাসূল ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, ওরা সকলেই সমান। (মুসনাদে আহমাদ ৩৮০৯)

ব্যাংকের অবস্থা এই যে, তার পূর্ণ সম্পদ কয়েকটি বিষয়ের সমষ্টি। যথা-

১-মূলধন।

২-সঞ্চয়কারীদের জমাকৃত টাকা।

৩-জায়েজ ব্যবসার আমদানী।

৪-সুদ এবং হারাম ব্যবসার আমদানী।

এ চারটি বিষয়ের মাঝে কেবল ৪র্থ সুরতটি হারাম। বাকিগুলো যদি কোন হারাম কাজ না হয় তাহলে মূলত জায়েজ।

যেসব ব্যাংকে প্রথম ৩টি বিষয়ের লেনদেন অধিক। আর ৪র্থ বিষয়টি তথা হারাম লেনদেনের লভ্যাংশ কম সেসব ব্যাংকে সেসব ডিপার্টমেন্টে চাকরী করা যাতে হারাম কাজ করতে না হয় তাহলে তা জায়েজ হবে। এবং বেতন নেওয়াও জায়েজ হবে। তবে উত্তম হল এ চাকরীও ছেড়ে দেয়া।

কিন্তু যদি হারাম আমদানী বেশি হয় হালালের তুলনায়, বা হারাম কাজে জড়িত হতে হয় তাহলে উক্ত ব্যাংকে চাকরী করা জায়েজ নয়। এ থেকে বেতন নেওয়াও জায়েজ নয়। বেতন নিলে তা হারাম হিসেবে গণ্য হবে। {ফাতওয়ায়ে উসমানী-৩/৩৯৪-৩৯৬}

তবে যদি ব্যাংকের এমন কোনো সেক্টরের কাজ হয়, যাতে সুদী কাজে জড়িত হতে হয় না। যেমনঃ ড্রাইভার, ঝাড়ুদার, দারোয়ান, জায়েজ কারবারে বিনিয়োগ ইত্যাদি সেক্টর হয়, তাহলে যেহেতু এসবে সরাসরি সুদের সহায়তা নেই তাই এমন সেক্টরে কাজ করার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে বেতনের উৎস কি হবে? কর্মীবৃন্দকে কোথা থেকে দেওয়া হবে?

তাই বলা যায় যে, হারাম সংমিশ্রিত মাল থেকে বেতন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শরয়ী মূলনীতি হল- যদি বেতন হালাল-হারাম এর সংমিশ্রিত মাল থেকে দেওয়া হয়, এবং হারাম মালের পরিমাণ আধিক্য থাকে , তাহলে সেই বেতন গ্রহণ জায়েজ হবে না। তবে যদি হারাম মাল পরিমাণে কম থাকে, তাহলে বেতন গ্রহণ এক্ষেত্রে জায়েজ হবে। যেমন, জালেম বাদশাহর হাদিয়া গ্রহণ জায়েজ নয়। কারণ তার অধিকাংশ মালের উৎস হারাম থেকেই হয়। তবে যদি কারো ব্যাপারে জানা যায় যে, তার অধিকাংশ মাল হালাল, এ হিসেবে যে, সে ব্যবসায়ী বা জমিদার, তাহলে তার থেকে হাদিয়া গ্রহণ জায়েয। এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা সম্পদে হারামের সামান্য সংমিশ্রণ থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের মাল অল্প হারাম থেকে মুক্ত নয়। তাই এতে আধিক্যের বিষয়টি বিবেচিত হবে। { ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৪২}

তথ্যসূত্র: [//www.ifatwa.info](http://www.ifatwa.info)

■ ইসলামী ব্যাংকে চাকুরি করা বৈধ?

ইসলামী ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামী শরিয়াহ (ইসলামিক আইন) অনুসারে পরিচালিত হয় এবং এর সকল কর্মকাণ্ডে সুদ পরিহার করে চলে (তাদের দাবি অনুযায়ী)। এর মূলনীতি হলো লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি এবং সুদমুক্ত লেনদেন। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং হালাল পথে সম্পদ অর্জন করা।

বর্তমান সময়ে আমাদের বাংলাদেশে কাগজে কলমে নাম সর্বস্ব কিছু ইসলামি ব্যাংক রয়েছে। বা ইসলামি ব্যাংকিং শাখা রয়েছে। আমাদের অনুসন্ধান মতে এ সমস্ত ইসলামি ব্যাংক সমূহ নাম সর্বস্ব-ই। তাদের শরীয়া বোর্ড শুধুমাত্র লোক দেখানো। তারা তাদের শরীয়া বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাংক পরিচালনা করে না বললে অত্যাুক্তি হবে না। হয়তো দুয়েকটি ব্যতিক্রম ঘটনা থাকতে পারে।

তথাকথিত ইসলামি ব্যাংক গুলিকে দুটি প্রশ্ন করলে আপনি তাদের ইসলাম অনুসরণের ফরমালিটি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। যথা-

আপনি তাদের কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন—

(১) আপনাদের ব্যাংকে বর্তমানে সেভিংস, এফ.ডি.আর, ডি.পি.এস রেট কত?

(২) ঋণ বা লোনের মুনাফা রেট কত?

উত্তর যদি ফিক্সড মুনাফা বা লোনে ফিক্সড লাভ আদান-প্রদান সম্পর্কিত কিছু আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, তারা শরীয়াহকে ফলো করছে না।

কেননা হাদীসে এসেছে,

"প্রত্যেক ঐ ঋণ যা কিছু মুনাফাকে নিয়ে আসবে তা সুদ। আর সুদ কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী হারাম।"

সুতরাং লাভ কখনো নির্দিষ্ট হতে পারে না। তাই এটা সুদ হবে।

তবে হ্যাঁ, মুদারাবা ব্যবসা! তথা একজনের টাকা অন্যজনের শ্রম, শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল মুনাফা শতকরা হিসেবে নির্দিষ্ট থাকতে হবে। এবং লাভে লোকসানে উভয়কে শরীক থাকতে হবে। সাথে সাথে ব্যবসার মেয়াদকালও উল্লেখ থাকতে হবে।

হয়তো দুয়েকটি ব্যাংক পেতে পারেন যারা মুদারাবা ভিত্তিক ব্যবসা করে এবং বাস্তবে তাদের ব্যবসা পরিচালিত রয়েছে। অর্থাৎ যারা মুনাফাকে নির্দিষ্ট করে বলে না, সময়ে সময়ে তাদের মুনাফার পরিমাণ পরিবর্তন আসে। এমন ব্যাংক পাওয়া গেলে সেটাতে মুদারাবা ব্যবসা করার সুযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, মুরাবাহার একটি অপরিহার্য শর্ত হল, পণ্যটি কিছুক্ষণের জন্য হলেও ব্যাংকের দায়িত্বে ও তার রিস্কে যেতে হবে। যে সময়ের মধ্যে সেটি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা ব্যাংকের ক্ষতি বলেই ধর্তব্য হবে। যদি মুরাবাহার পণ্য ক্লায়েন্ট (গ্রাহক) কে বিক্রির পূর্বে এমন কোনো ঝুঁকি (রিস্ক) ব্যাংক বহন না করে তবে কারবার হারাম হবে।

হযরত মাওলানা তকী উছমানী এবং অন্যান্য ফকীহগণের (যারা ব্যাংকের মুরাবাহার অনুমোদন দিয়েছেন) মতে এটিই একমাত্র শর্ত যা মুরাবাহাকে সুদী কারবার থেকে ভিন্ন করে। কারণ সুদী লোনের মধ্যে ব্যাংক ক্লায়েন্টকে টাকা দেওয়ার পর তার কোনো রিস্ক সে বহন করে না। এখন যদি মুরাবাহাতেও এমনটি ঘটে এবং গ্রাহক তথা ক্লায়েন্টকে পণ্য হস্তান্তরের পূর্বে ব্যাংক তার ঝুঁকি বা রিস্ক গ্রহণ না করে তবে কারবারটি হবে সুদী লেনদেনের নামান্তর।

মুরাবাহার আরেকটি শর্ত হল ক্লায়েন্টের নিকট নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করে দেওয়ার পর তা আর বৃদ্ধি করা যাবে না। অর্থাৎ সনাতনী ব্যাংকগুলো যেমন বছরান্তে বা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সুদের হার বাড়িয়ে দেয় সেভাবে মুরাবাহা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না। করলে তা সুদ হবে।

আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক বলে দাবী করে, তারা যদি বাস্তবেই ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ব্যাংক চালায়, যেমনটি তারা দাবী করে থাকে, এর বিপরীত যদি কোনো কিছু প্রমাণিত না হয়, তাহলে সেখানে টাকা রাখা, লভ্যাংশ নেওয়া জায়েয হবে।

তবে আমাদের জানা মতে— বাংলাদেশে কোন ব্যাংকই সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামীক রুলস মেনে ব্যাংকিং করছে না। তাই এখানে ঢালাও ভাবে চাকুরী জায়েজ হবেনা।

এখানে সন্দেহ প্রবণতা থাকে যে, ইসলামি ব্যাংকগুলো সত্যিই শরয়ী বিধিমালা গুলো ফলো করছে কি না? যেহেতু আমাদের জানামতে তারা তা করে না তাই সেই ভিত্তিতে আমরা বলবো, সুদী সেক্টর ব্যতীত ভিন্ন সেক্টরে চাকুরী করার অনুমোদন থাকলেও (যেসব পদ সুদী অর্থ লেনদেনের সাথে জড়িত নয়, যেমন— সিকিউরিটি, গাড়ি চালনা, মালি, সাধারণ শ্রমিক ইত্যাদি এসব চাকরি করা যাবে।)

তবে— সুদ দেয়া, নেয়া, সাক্ষী থাকা, লেখালেখি, কমিশন, অ্যাজেন্ট তথা সরাসরি সুদসংশ্লিষ্ট কাজগুলো করা জায়েয হবে না।

কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে,

জাবের রাযি. বলেন,

”لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ ভক্ষণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের লেখক এবং সাক্ষীগণকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, (গুনাহের ক্ষেত্রে) তারা সবাই বরাবর।’ (মুসলিম ১৫৯৮)

তবে— সর্বাবস্থায় এখানে চাকরি না করাটাই হবে তাকওয়ার পরিচায়ক।

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা তাগাবুন ১৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ

কোন বান্দা স্ফতিকর কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে বৈধ অস্ফতিকর বিষয় না ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত মুত্তাকীদের
পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না। (তিরমিযি ২৪৫১)

তথ্যসূত্র: <https://www.ifatwa.info>

■ ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খোলার বিধান:

অনেক উলামায়ে কেরামের মতে, বাংলাদেশে কোন ব্যাংকই সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামীক রুলস মেনে
ব্যাংকিং করছে না। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংকে টাকা না রাখা ভাল। কিন্তু প্রয়োজন হওয়ার
কারণে কারেন্ট একাউন্ট খোলা জায়েজ। ডিপোজিট এ জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী কোন একাউন্ট খোলা জায়েজ
হবে না।

عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكتابه

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-“যে সুদ খায়, যে
সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী যে হয়, আর দলিল যে লিখে তাদের সকলেরই উপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ
করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৩৮০৯, মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদিস নং-৪৯৮১)

তবে যেহেতু বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ছাড়া বাকি ব্যাংকগুলো আমভাবে সুদী কারবার করে থাকে। শরয়ী বিধানের কোন তোয়াক্কাই করে না। সেই হিসেবে ইসলামী ব্যাংকগুলো শরয়ী বিধান পালনের কিছুটা হলেও চেষ্টা করে থাকে। যদিও পূর্ণাঙ্গ শরয়ী রুলস তারাও অনুসরণ করে না বলেই আমরা জানি। কিন্তু মন্দের ভাল অবশ্যই। তাই অন্য ব্যাংকে একাউন্ট খোলার তুলনায় ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা নিরাপদ বলেই মনে হয়। বাকি আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আর যদি কারেন্ট একাউন্ট খোলা সম্ভব না হয়, তাহলে বাধ্য হলে ডিপোজিট ও দীর্ঘমেয়াদী একাউন্টও জায়েজ আছে। তবে তার মুনাফাটি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিবে।

[১৭৩: ۲] فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা বাকারা-১৭৩)

তথ্যসূত্র: [//www.ifatwa.info](http://www.ifatwa.info)

■ প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো কতটুকু শরীয়াহসম্মত?

আল্লাহ তায়ালা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না। আল্লাহকে ভয় করো। তাহলে তোমরা সফল হতে পারবে।’ -সূরা আল ইমরান: ১৩০

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكتابه

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-“যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী যে হয়, আর দলিল যে লিখে তাদের সকলেরই উপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৩৮০৯, মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস নং-৪৯৮১)

বর্তমানে আমাদের দেশে নিজেদেরকে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক বলে দাবী করে (আমার জানা মতে) ০৮ টি।

1. ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। Islami Bank Bangladesh Limited
2. আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। Al-Arafah Islami Bank Limited
3. এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক অফ বাংলাদেশ লিমিটেড। Export Import Bank of Bangladesh Limited
4. সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড। Social Islami Bank Limited
5. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। Shahjalal islami Bank Limited
6. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। First Security Islami Bank Limited
7. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড। Union Bank Limited
8. আই সি বি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। ICB Islamic Bank Limited

আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে কোন ব্যাংকই সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামীক রুলস মেনে ব্যাংকিং করছে না। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংকে টাকা না রাখা ভাল। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে কারেন্ট একাউন্ট খোলা জায়েজ। ডিপোজিটে দীর্ঘমেয়াদী কোন একাউন্ট খোলা জায়েজ হবে না।

عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكتابه

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-“যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী যে হয়, আর দলিল যে লিখে তাদের সকলেরই উপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৩৮০৯, মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস নং-৪৯৮১)

তবে যেহেতু বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলো ছাড়া বাকি ব্যাংকগুলো আমভাবে সুদী কারবার করে থাকে। শরয়ী বিধানের কোন তোয়াক্কাই করে না। সেই হিসেবে ইসলামী ব্যাংকগুলো শরয়ী বিধান পালনের কিছুটা হলেও চেষ্টা করে থাকে। যদিও পূর্ণাঙ্গ শরয়ী রুলস তারাও অনুসরণ করে না বলেই আমরা জানি। কিন্তু মন্দের ভাল অবশ্যই। তাই অন্য ব্যাংকে একাউন্ট খোলার তুলনায় ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা নিরাপদ বলেই মনে হয়। বাকি আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আর যদি কারেন্ট একাউন্ট খোলা সম্ভব না হয়, তাহলে বাধ্য হলে ডিপোজিট ও দীর্ঘমেয়াদী একাউন্টও জায়েজ আছে। তবে লভ্যাংশ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিবে।

[১৭৩: ۲] فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা বাকারা-১৭৩)

তথ্যসূত্র: [//www.ifatwa.info](http://www.ifatwa.info)

■ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার জায়েজ কি না?

ক্রেডিট কার্ড হল এমন একটি প্লাস্টিক কার্ড, যে কার্ডের বিপরীতে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহকদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে এবং গ্রাহক সেই মঞ্জুরকৃত ঋণের টাকা তার চাহিদা মত যে কোন সময় পণ্য এবং সেবা ক্রয় করতে পারে অথবা ক্যাশ টাকা উত্তোলন করতে পারে। এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকা আবার ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে—

[২:২৮৮] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। [সূরা বাকারা-২৮৮]

[৩:১৩০] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। [সুরা আলে ইমরান-১৩০]

হাদিসে এসেছে—

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

আল্লাহর রাসূল ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, ওরা সকলেই সমান। (মুসনাদে আহমাদ ৩৮০৯)

সুতরাং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে যেহেতু সুদী কারবারে জড়িত হতে হয়, সুদ প্রদান করতে হয়, তাই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা জায়েজ নেই।

তথ্যসূত্র: [//www.ifatwa.info](http://www.ifatwa.info)

■ সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

অনেকে সুদ ও মুনাফাকে একই মনে করেন। এমনকি ‘সুদ তো মুনাফার মতই’ বলতেও দ্বিধা করেন না। অথচ এ দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

লেনদেনের ক্ষেত্রে ঋণের অতিরিক্ত গ্রহণ করলে তা—সুদ। অপরদিকে ব্যবসায় মূলধন খাটানোর মাধ্যমে মূলধনের অতিরিক্ত আয় হলো—মুনাফা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ১০০ টাকা ঋণ দেয় এ শর্তে যে এক মাস পরে তাকে ১১০ টাকা দিতে হবে। এখানে অতিরিক্ত এক টাকা সুদ, যা ইসলামী শরিয়তে হারাম।

বিপরীত পক্ষে, কেউ যদি হাট থেকে ৫০ টাকা দিয়ে এক কেজি চাল কিনে অন্য বাজারে গিয়ে ৬০ টাকায় বিক্রি করে, তাহলে যে ১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে সুদ বলা যাবে না। এই পাঁচ টাকা লাভ, যা হালাল বলে গণ্য হবে।

আরও বিস্তারিত বললে—

১. সুদ হ'ল একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, যা হারাম (বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৮৮)। আর মুনাফা হল হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশ।

২. সুদ হল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, كُنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا, 'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে, সেটিই সুদ'। পক্ষান্তরে মুনাফা হ'ল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

৩. সুদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

৪. সুদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

৫. সুদ কখনই ঋণাত্মক হতে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হতে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হতে পারে।

৬. সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।

অন্যদিকে মুনাফা হচ্ছে—

১. যা সাধারণ সুস্থ-শান্ত অবস্থায় চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মাধীন উন্মুক্ত স্বাধীন বাজারে লেনদেনের দরুন অর্জিত হয়।

২. উৎপাদন ব্যবস্থা ও পণ্য বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করার পর ব্যবসায়ীদের নিকট যতটা উদ্বৃত্ত থাকবে।

৩. ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতা থেকে আনুপাতিক মূল্যে যা অর্জিত হবে।

অথবা মুদারাবার ভিত্তিতে মুনাফা অর্জন করা যায়। ব্যবসার ক্ষেত্রে এক পক্ষের মাল, অপর পক্ষের শ্রম দেওয়াকে মুদারাবা বলা হয়। এটি জায়েজ আছে।

মুদারাবার ক্ষেত্রে শরীয়তের উসুল হলো যাহা লাভ হবে, তাহা শতকরা হারে উভয়ের মাঝে বন্টন করার চুক্তি করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট টাকার চুক্তি করা যাবেনা, লোকসান হলে আগে লাভের টাকা থেকে সেটা পূরন করা হবে, অতঃপর মূলধন থেকে পূরন করা হবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

بَابُ الشَّرَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، سَلَّمَ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ، وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا تُصِيبُ فَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ .

শারীকাত (অংশিদারী) ও মুদারাবা ব্যবসা

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সাদ (রাঃ), আম্মার (রাঃ) ও আমি

গানীমাতের মালের ব্যাপারে অংশীদার হই (এই মর্মে যে, আমরা যা পাবো তা তিনজনে ভাগ করে নিবো)।

আম্মার ও আমি কিছুই আনতে পারিনি। অবশ্য সাদ (রাঃ) দু'জন যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসেন।

নাসায়ী ৪৬৯৭, আবু দাউদ ৩৩৮৮, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/১৯৪, ইরওয়া ১৪৭৪।

■ **উপসংহার:** সমসাময়িক বৈশ্বিক অর্থনীতি এক জটিল সুদনির্ভর আর্থিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত যার প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহুমাত্রিকভাবে বিস্তৃত। আলোচ্য গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে— সুদ কেবল একটি আর্থিক লেনদেন নয়; বরং এটি অর্থনৈতিক অসমতা সৃষ্টি, সম্পদের অযৌক্তিক কেন্দ্রীকরণ, ঋণ-নির্ভর দাসত্ব এবং উৎপাদনহীন মুনাফার মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে রিবা শুধু নিষিদ্ধই নয়, বরং মানবকল্যাণবিরোধী একটি কাঠামোগত ব্যাধি—যা ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন, ঝুঁকির ন্যায্য ভাগাভাগি এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বড় প্রতিবন্ধক।

এই গবেষণার সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে 'রিবা' বা সুদ এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা, যা শুধু অর্থনৈতিক ভারসাম্যই নষ্ট করে না; বরং সমাজের নৈতিক, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক কাঠামোকেও দুর্বল করে। কুরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা সর্বাধিক কঠোর ভাষায় এসেছে— “যদি তোমরা সুদ ছেড়ে না দাও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৭৯)

এটি নির্দেশ করে যে রিবা মানবকল্যাণের বিপরীতমুখী এবং সামাজিক অন্যায়ের মূল।

সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ রিবার ৭৩ প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ক্ষুদ্রতম অংশও নিজের মাঝের সঙ্গে ব্যভিচারের সমতুল্য গুরুতর পাপ—যা এর ভয়াবহতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। রিবার এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা ইসলাম শুধু ধর্মীয় কারণে নয়; বরং আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতা, মানবিক দায়বদ্ধতা এবং বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভারসাম্যের জন্য আরোপ করেছে।

সুদাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার ফলাফল—দারিদ্র্য বৃদ্ধি, সম্পদের বৈশ্বিক অসম বণ্টন, সামাজিক বৈষম্য, অপরাধ বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, সার্বভৌমত্বের সংকট, সর্বোপরি অর্থনৈতিক দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। সমগ্র মুসলিম জাতিকে সিস্টেমটিক ওয়েতে সুদের দাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। একদিকে দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খল অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার হুশিয়ারি। গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এ যেনো শুধুই লান্জনা!

সমাধান কি? কিভাবে মুসলিম উম্মাহ মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া সোজা করে উমরের যুগে ফিরে যেতে পারে? খুঁজে পেতে পারে হারানো ঐতিহ্য- সম্মান আর আধিপত্য?

সমাধান রয়েছে—ইসলামী অর্থব্যবস্থায়। সমাধান রয়েছে—কুরআন ও হাদীসের অনুসরণে। সুদমুক্ত অর্থ ও সমাজব্যবস্থায়। আলোচ্য গবেষণায় দেখানো হয়েছে কিভাবে ইসলাম ন্যায্য ও ইনসাফ ভিত্তিক, ঝুঁকি-বণ্টনভিত্তিক, অংশীদারিত্বভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা নির্দেশ করে ইসলামী আর্থিক বিকল্প—যেমন মুশারাকা, মুদারাবা, মুরাবাহা, সুকুক এবং ঝুঁকি-ভাগাভাগি ভিত্তিক বিনিয়োগ মডেল—একটি টেকসই, ন্যায্যসঙ্গত ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। এগুলো উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, সামাজিক বৈষম্য কমায় এবং বাস্তব সম্পদ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। আধুনিক আর্থিক সংকটগুলোর বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে সুদনির্ভর অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো একটি বিকল্প নৈতিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে আরও দৃঢ় করেছে।

অতএব, বলা যায় যে সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো কেবল ধর্মীয় বিধানের পরিপালন নয়; এটি একটি মানবিক, টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত পথও বটে। সমাজকল্যাণমুখী নীতি, ন্যায্যভিত্তিক বণ্টন এবং উৎপাদনশীল অর্থায়নের সমন্বয়—এটাই ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি। এই গবেষণা তাই

সুদমুক্ত আর্থিক কাঠামোকে শুধু একটি নৈতিক দাবি হিসেবে নয়, বরং আধুনিক বিশ্বের জন্য একটি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিকল্প হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করে।

সবশেষে বলা যায়—রিবার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, মানবিক দায়িত্ববোধ এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে একটি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা সময়ের দাবি। বাস্তবসম্মত, স্থিতিশীল এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম বিকল্প কাঠামো ইসলামী অর্থব্যবস্থা আজ শুধু ধর্মীয় বিকল্প নয়; বরং আধুনিক বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য একটি ন্যায়পরায়ণ, টেকসই এবং মানবকল্যাণমূলক সমাধান। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে রিবা পরিহার এবং শরীয়াহসম্মত আর্থিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণই অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ ও সমতাপূর্ণ অর্থনৈতিক সমাজ গঠনের পথে সর্বাধিক নিরাপদ ও নৈতিক নির্দেশনা।

আলোচনা শেষ করছি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আরও একটি সতর্কতামূলক আয়াত দিয়ে যা সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়াতাতাআলা পক্ষ থেকে একইসাথে আদেশ ও উপদেশ স্বরূপ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
إِن تُبْنُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

— সূরা আল বাকারা ২: (২৭৮-২৭৯)

■ সুপারিশ (Recommendations)

- মুসলিম দেশগুলোতে সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ইসলামিক বিনিয়োগ ও ফিন্যান্স সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগে স্বনির্ভরতা অর্জন।
- ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ও সমন্বয়।

- শরীয়াহ-সম্মত নীতি ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত করা।
- মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সুদমুক্ত আর্থিক সহযোগিতা ও ফান্ডের মাধ্যমে আঞ্চলিক শক্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি।
- সুদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে মুক্তি ও ইসলামিক অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য রাজনৈতিক বা সামরিক চাপ হ্রাস করা।
- শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম জনগণকে সুদ-নির্ভর অর্থনীতি ও ইসলামী বিকল্প সম্পর্কে সচেতন করা।
- গবেষণা ও উদ্ভাবন (Islamic Finance Research Institute) গঠন করা যেতে পারে।

■ রেফারেন্স / গ্রন্থপঞ্জি

১. সুদ: পরিষ্কার বিদ্রোহ —শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানি
২. সুদ হারাম কর্তে হাসানা একটি সমাধান— মোহাইমিন পাটোয়ারী
৩. আল কুরআন
৪. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
৫. হাদীসগ্রন্থ (সহিহ বুখারী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)
৬. www.ifatwa.info
৭. মাসিক আল কাউসার
৮. মাসিক আত-তাহরীক
৯. আলোচনা: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানি
১০. Principles of Economics

১১. Principles of Finance

১২. প্রতিদিনের সংবাদ

১৩. BBC News Bangla

১৪. The Heritage Foundation's Report

১৪. The world bank : A critical history

১৫. Google